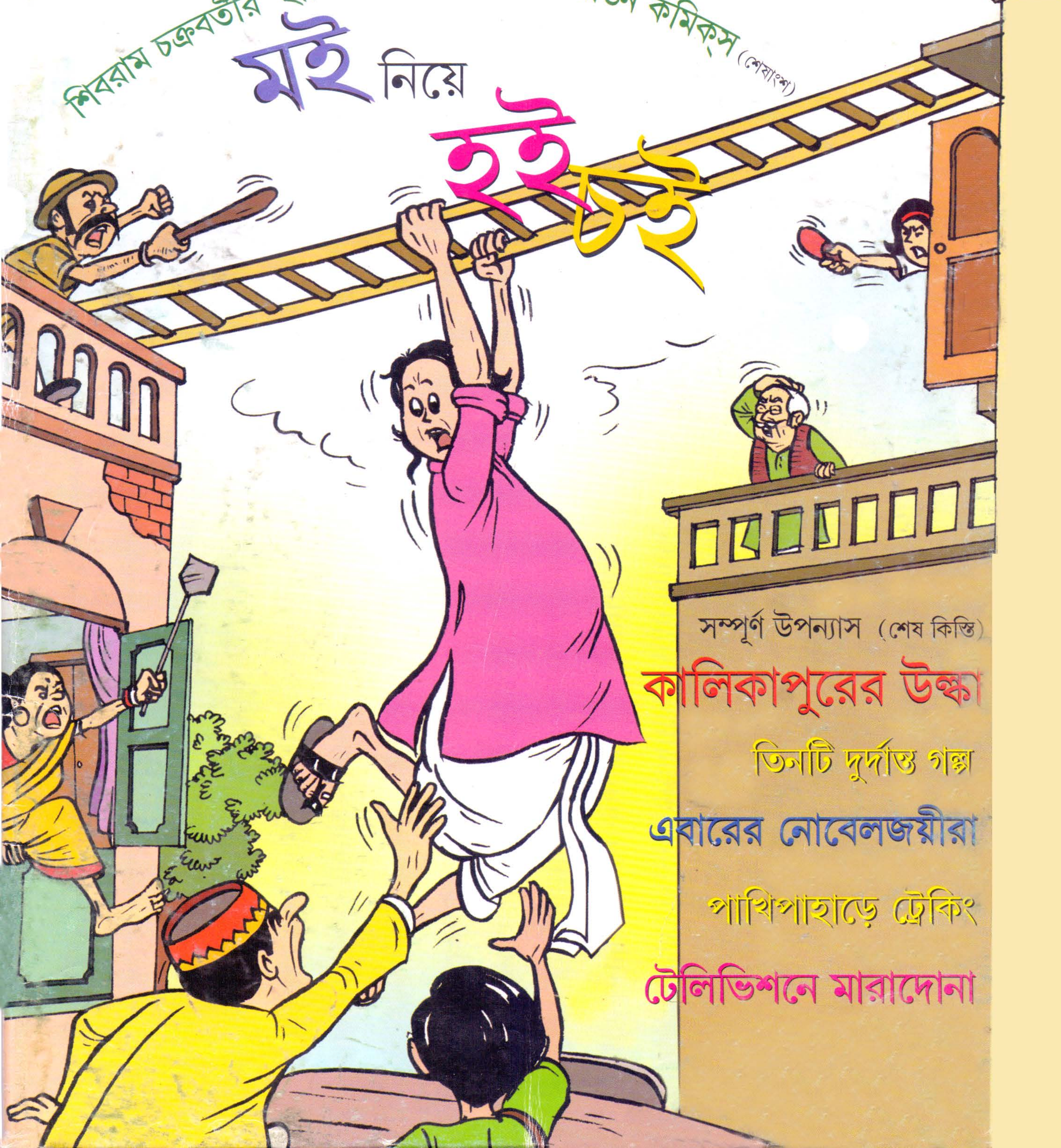
নভেম্বর ২০০৫ ● দশ টাকা

# আনন্দমেলা

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্পের জমজমাট রঙিন কমিকস (শেষাংশ)

## মই নিয়ে হইচই



সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষ কিস্তি)

**কালিকাপুরের উল্কা**

তিনটি দুর্দান্ত গল্প

এবারের নোবেলজয়ীরা

পাখিপাহাড়ে ট্রেকিং

টেলিভিশনে মারাদোনা




# পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

## একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

# হাসি-মজায় ভরা উইকএণ্ডের মজা
# এখন একেবারে নতুন হাঙ্গামা টিভি'তে!




UTV আসুন আমাদের এখানে www.humgamatv.com

# আনন্দমেলা

৩১ বর্ষ ৭ সংখ্যা কার্তিক ১৪১২ নভেম্বর ২০০৫

## মই নিয়ে হইচই ৩৩

**শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের রঙিন কমিক্‌স (শেষাংশ)**

পিসেমশাইয়ের নির্দেশে মই নিয়ে বাসে চেপে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে শান্তালয়ে শান্তামাসিমার কাছে যাচ্ছিল শিবরাম। মইয়ের ধাক্কায় যাত্রীরা অস্থির। এক সময় বাস থেকে শিবরামকে জোর করে নামিয়ে দিল সবাই। মই দেখে মাসিমা রেগে আগুন। তিনি নাকি এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না। মই নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। পিসেমশাইয়ের কথায় বিরাট ঘোরপ্যাঁচ। তিনি নাকি শান্তালয় বলেননি, বলেছেন শান্ত্যালয়। কী হল এর পর?

**ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়**



## কালিকাপুরের উল্কা ১৬

**সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)**

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

কালিকাপুরে সূর্যকান্তবাবুর বাড়িতে ঘটতে লাগল রহস্যজনক সব ঘটনা। মানুদা, সুমে, নেরু, বাঘা, নন্তু, ভুতো আর পিতুকে সম্মোহিত করে ফেললেন গজেশ সামন্ত। রক্ষীদের এবং দু'টো কুকুরকে গুলি করে কাকাবাবুর মেয়ে রানিকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে গুন্ডারা! পিতুর ভয়ংকর ক্যারাটে ধরাশায়ী করল বেশ কিছু দুষ্কৃতীকে। বিজনেসম্যান সন্দীপ শেঠি সূর্যকান্তবাবুর জমি কেনার জন্য তাঁকে রানির প্রাণের ভয় দেখাতে লাগলেন। তারপর...

## অন্যান্য পাতায়


ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৫
কমিক হিরো ৬
বিজ্ঞানে এবারের নোবেল ৩২
রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি ৪৩
কুইজ় ৪৪
আনন্দমেলা ক্লাব ৪৫
নানারঙের রামধনু ৫১
অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৫২
হাসছি দ্যাখো ৫২
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৩
বেড়ানো ৫৪


প্রচ্ছদ: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

## গল্প


ভবশংকরের গোয়েন্দাগিরি ৮ সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়
রহস্যময়ী মেডুসা ৪৬ সুখলতা মজুমদার
জন্মান্তর ৫৬ অনন্ত সিংহ




## খেলাধুলো


টেলিভিশনে মারাদোনা ৬০ সন্দীপ দাশগুপ্ত
'জাদুকর' জ়িদান ৬১ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
মোটর রেসিংয়ের 'নতুন রাজা' ৬২ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌরভের পরীক্ষা ৬৩ অনুপম দাশগুপ্ত
অ্যাথলেটিক্সের নতুন বাজি সুস্মিতা ৬৪ অভিজিৎ সেনগুপ্ত
ফুটবল মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি ৬৫ চন্দন রুদ্র
ফ্রিস্টাইল ৬৬





সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।






## ‘হিজিবিজি’কে নিয়ে মাতামাতি কেন?

‘আনন্দমেলা’য় কমিক্স এত কম ছাপা হচ্ছে কেন? আগে তো প্রচুর কমিক্স ছাপা হত। আগে আনন্দমেলা পড়তে খুব ভাল লাগত, এখন আগের মতো আর ভাল লাগে না। ‘হিজিবিজি’কে নিয়ে এত মাতামাতি কীসের? হিজিবিজির জন্য পাতা নষ্ট না করাই ভাল, কারণ হিজিবিজি তো কোনও বিখ্যাত চরিত্র নয়। ‘পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা’য় ফেলুদার ছবি ঠিকমতো আঁকা হয়নি। ছবি অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

**মৃণ্ময় মুখোপাধ্যায়**
*জে এল বিদ্যাভবন*
*রামপুরহাট, বীরভূম*

## ‘পোকেমন’ নিয়ে লেখা অনবদ্য

নতুনভাবে সাজানো ‘আনন্দমেলা’র সেপ্টেম্বর সংখ্যা পড়ে দারুণ লাগল। ‘হিজিবিজির দেশে’ পড়ে খুব ভাল লেগেছে। ‘পোকেমন’ নিয়ে লেখাটিও অনবদ্য। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সম্পর্কে কোনও লেখা ছাপলে ভাল লাগবে।

**সরোজ সাধু**
*অষ্টম শ্রেণি*
*আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়*

## আরও কমিক্স চাই

আমি নিয়মিত ‘আনন্দমেলা’ পড়ি। সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ‘ম্যাজিক পাথর’ গল্পটি ভাল লাগল। এই সংখ্যায় কোনও কমিক্স নেই কেন? ‘রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি’ ছাড়াও অন্য কমিক্স ছাপলে ভাল লাগবে।

**সৌরভ দাস**
*চতুর্থ শ্রেণি*
*পশ্চিম পুটখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়*

## গল্প থাকুক বেশি

আনন্দমেলায় ধারাবাহিক উপন্যাস না দিয়ে গল্পের সংখ্যা বাড়ালে ভাল হয়। ‘বিজ্ঞানের টুকিটাকি’তে যে খবরগুলো ছাপা হয়, তা অনেক সময়ই পুরনো বা আগে প্রকাশিত। নতুন খবর দিন। হিজিবিজিকে অনেক ভালবাসা। আমি ওর বন্ধু হতে চাই।

**ঋতুশ্রী সেনগুপ্ত**
*নবম শ্রেণি*
*সুধীর মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, মধ্যমগ্রাম*

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার ‘ই-মেল’-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

## ঘনাদা ও ননীদা কমিক্স দারুণ

‘পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা’ পড়ে ভাল লাগল। ‘কাকাবাবু ও সাদা ঘোড়া’, ‘সর্পরহস্য সুন্দরবনে’ এবং ‘ঘোরপ্যাঁচে প্রাণগোবিন্দ’ ভাল লেগেছে। তবে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা ফেলুদা কমিক্স সম্পর্কে আমার একটি অভিযোগ আছে। ওঁর আঁকায় ফেলুদা বা অন্য চরিত্রগুলোর মুখ অনেক সময় বিকৃত দেখায়। ঘনাদা ও ননীদার কমিক্স আমার খুবই ভাল লেগেছে। আশা করি আগামী দিনে এ ধরনের কমিক্স আরও ছাপা হবে।

**তন্ময় বাগ**
*অষ্টম শ্রেণি, নিকাশি হাই স্কুল*
*পূর্ব মেদিনীপুর*

## অনবদ্য পূজাবার্ষিকী

এবারের ‘পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা’ হাতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। ফেলুদার রঙিন কমিক্স এককথায় দারুণ। ‘ইনফিনিটি থেকে ফেরা’ গল্পটি পড়ে খুব ভাল লাগল। বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্যও জানতে পারলাম গল্পটি পড়ে।

**সৌরভ কুমার**
*অষ্টম শ্রেণি*
*ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল*
*আসানসোল, বর্ধমান*



# পাঠকের পাতা

## 'দুর্গাঠাকুরদের সকলকে একটা করে মোবাইল ফোন দেওয়া হোক' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

### ১

দুর্গার হাতে বি এস এন এল-এর মোবাইল। তিনি ভীষণ চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করছেন। কাজের চাপে তিনি এবার চারদিনের বদলে তিনদিনের জন্য মর্ত্যে আসছেন। অথচ কথাটা তিনি কিছুতেই মর্ত্যবাসীদের জানাতে পারছেন না। তাঁর মোবাইলের ক্যাশকার্ড ফুরিয়ে গিয়েছে। দেবসেনাপতি কার্তিক কয়েকদিন ধরে বাড়ির বাইরে। গণেশের মোবাইলে ইনকামিং কল হচ্ছে, কিন্তু আউটগোইং হচ্ছে না। গণেশের মোবাইলে ফোন করে কার্তিক জানিয়েছেন তাঁর বাড়ি ফিরতে আরও কিছুদিন দেরি হবে। সরস্বতীর মোবাইল কয়েক দিন ধরে কাজ করছে না। লক্ষ্মী তাঁর মোবাইল বন্ধুর বাড়িতে ফেলে এসেছেন। কীভাবে মর্ত্যে তাঁদের আগমনের আগাম বার্তা জানানো যাবে?

**সায়ন রায়**
*সপ্তম শ্রেণি*
*বিঘাটি কিশোরীমোহন হাই স্কুল*
*হুগলি*

### ২

সপ্তমীর দিন দুপুরবেলা যখন বসে-বসে ভাবছি বিকেলে কোন জামা-প্যান্টটা পরব, কোন-কোন প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে যাব, তখন মনে হল, যদি এই অসুরদলনী দেবী এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আধুনিক কোনও সরঞ্জাম অর্থাৎ মোবাইল ফোন, গাড়ি ইত্যাদি থাকে, তা হলে খুব ভাল হয়। আর তার সঙ্গে যাঁরা পূজা-উদ্যোক্তা, তাঁদের কিছু-কিছু অসুবিধেও দূর হয়। যেমন, কোন দিন কোন শাড়ি পরবেন, কোন দিন কোন খাবার খাবেন, এই সব কথা যদি দুর্গাঠাকুররা ফোনে জানিয়ে দেন, তা হলে তাঁদের খুব সুবিধে হয়। তা ছাড়া গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, লক্ষ্মী, এঁদের মধ্যেও ভাল বোঝাপড়া হয়ে যাবে যে, কোন শপিং মলে পুজোর জামাকাপড় কিনবেন? কোন হোটেলে কোন খাবার খাবেন? কোন-কোন প্যান্ডেলে যাবেন, সবই ঠিক হয়ে যাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। তাই বলি কী, দুর্গাঠাকুরদের সকলকে একটা করে মোবাইল ফোন দিলে বেশ হয়!

**সপ্তক প্রামাণিক**
*অষ্টম শ্রেণি*
*লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠ, কলকাতা*

### ৩

মা দুর্গা ছেলেমেয়েদের নিয়ে মর্তে আসবেন। স্বর্গের গুপ্তচর খবর এনেছে, মর্তে মানুষরূপী অসুরদের খুব উৎপাত। তাই মা দুর্গা ঠিক করলেন, অস্ত্র না নিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে মর্তে যাবেন। ষষ্ঠীর দিন মর্তে অবতরণ করতেই মানুষরূপী অসুররা রে-রে করে ধেয়ে এল। কিন্তু এ কী! তারা অবাক! প্রতিপক্ষের হাতে তো কোনও অস্ত্র নেই! ভীষণ উৎসাহে তারা নিজেদের অস্ত্র বের করতেই মা দুর্গার দশ হাতে আর লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের সব হাতে এক-একটি করে মোবাইল ফোন বিভিন্ন রিং টোনে বাজতে শুরু করল। মা দুর্গা মাহাদেবকে মেসেজ পাঠালেন, বেশি করে ভূত, পেতনি পাঠানোর জন্য। মর্তের মানুষরূপী অসুররা অবস্থা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিল। মা দুর্গা তাঁর পুরো দলবল নিয়ে নিশ্চিন্তে নবমী পর্যন্ত কাটিয়ে দশমীতে মর্ত্য থেকে বিদায় নিলেন।

**দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**
*চতুর্থ শ্রেণি*
*আর্য বিদ্যাপীঠ প্রাইমারি সেকশন*
*পশ্চিম মেদিনীপুর*

## এবারের প্রতিযোগিতা

নভেম্বর মাস মানেই দীপাবলি, আলোর উৎসবের মাস। কালীপুজোর পরই ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটার মতো যদি বোনফোঁটাও চালু হত, কেমন হত তা হলে? এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় 'চালু হোক বোনফোঁটা'। স্কুলের যে-কোনও ছাত্রছাত্রী, যারা ফোর থেকে এইট-এ পড়ো, গদ্যে ১০ লাইনের মধ্যে তারাই লিখে পাঠাতে পার। লেখাটি হতে হবে মৌলিক এবং অপ্রকাশিত। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে হবে। সেরা তিনটি লেখা ছাপা হবে 'আনন্দমেলা'য়। লেখাটি ২০ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

**পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১



মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে মোমের স্পাইডারম্যান

**আসল নাম:** পিটার বেঞ্জামিন পার্কার। ভালবেসে 'স্পাইডি' নামেও স্পাইডারম্যানকে ডাকেন কেউ-কেউ।

**স্রষ্টা:** স্ট্যান লি এবং স্টিভ ডিটকো-র লেখা আর আঁকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল স্পাইডারম্যান কমিক্‌স।

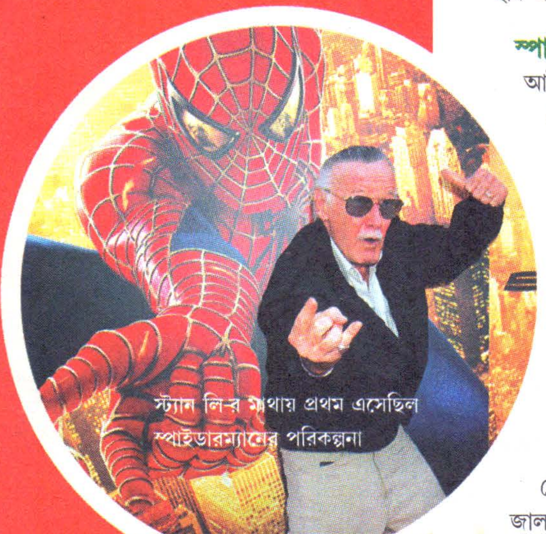
**প্রথম প্রকাশ:** ১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে। মার্ভেল কমিক্‌সের 'অ্যামেজ়িং ফ্যান্টাসি ১৫' নামে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্পাইডারম্যান এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, এর নাম হয়ে যায় 'অ্যামেজ়িং স্পাইডারম্যান'।

# টারানটুলা মাকড়সা থেকে

আশ্চর্য সব ক্ষমতার অধিকারী কমিক্‌সের স্পাইডারম্যানকে নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ২০০২ সালে। দু'বছর পরই দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'স্পাইডারম্যান টু'। লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল

**সৃষ্টির পিছনে:** ঠিক কীভাবে স্পাইডারম্যানের আইডিয়া এসেছিল স্ট্যান লি-র মাথায়? এই নিয়ে চালু আছে বেশ কিছু গল্প। লি'র মতে ডি সি কমিক্‌স থেকে একটি কমিক্‌স প্রকাশিত হত, যাতে 'টারানটুলা' নামে একটি মাকড়সা ছিল। তার সঙ্গে 'দ্য স্পাইডার' পত্রিকা থেকে কিছু ধারণা নিয়ে স্পাইডারম্যান তৈরি হয়েছিল। প্রথমে জ্যাক কার্বি নামে এক শিল্পীকে স্পাইডারম্যান আঁকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাজ লির পছন্দ না হওয়ায় স্টিভ ডিটকোকে মনোনীত করা হয়। ডিটকোর মতে, জো সাইমনের 'সিলভার স্পাইডার' থেকে এসেছিল স্পাইডারম্যানের অনুপ্রেরণা।

**কস্টিউম:** নীল আর লালে মেশানো মাকড়সার জাল আঁকা কস্টিউমে স্পাইডারম্যান বেশি জনপ্রিয় হলেও, গত শতকের আশির দশকে দেখা গিয়েছিল কালো কস্টিউমে সাদা মাকড়সার ছবি আঁকা স্পাইডিকে।



স্ট্যান লি-র মাথায় প্রথম এসেছিল স্পাইডারম্যানের পরিকল্পনা

**স্পাইডির গল্প:** বাবা রিচার্ড পার্কার। মা মেরি পার্কার। দু'জনেই মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ-র এজেন্ট ছিলেন। পিটারের অল্প বয়সে তাঁরা মারা গেলে আঙ্কল বেন আর আন্ট মে-র কাছে নিউ ইয়র্কে বড় হতে থাকে পিটার। পনেরো বছর বয়সে একটি বিজ্ঞানমেলায় বেড়াতে গিয়ে এক তেজস্ক্রিয় মাকড়সা কামড়ায় চশমা-চোখে লাজুক ছেলেটিকে। তারপর থেকেই তার মধ্যে মাকড়সার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের কৃতী ছাত্র পিটার এম্পায়ার স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিস্ট্রির স্নাতক। সাম্প্রতিক কিছু কমিক্‌সে অবশ্য তাঁকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেতেও দেখা গিয়েছে। উচ্চতা পাঁচ ফুট ১০ ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউন্ড। 'ডেলি বাগল' নামে এক পত্রিকায় ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেন পিটার। স্ত্রীর নাম মেরি জন।

**স্পাইডারম্যানের শক্তি:** গায়ের জোর ভীষণ! জখম হলেও তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারে। ক্ষিপ্রতা সাধারণ মানুষের চেয়ে পনেরো গুণ বেশি। বিপদের আগেই তার স্পাইডার সেন্স তাকে সতর্ক করে দেয়। দরকারে মাকড়সা-জাল ছুড়তে পারে। এর জন্য হাতের তালুতে দু'বার আঙুল দিয়ে চাপ দিতে হয় স্পাইডিকে।

**স্পাইডির শত্রুরা:** কার্নেজ, ড: অক্টোপাস, গরিন গবলিন, হ্যামার হেড, কিং পিন, স্কর্পিয়ন,

ভেনম, হাইড্রোম্যান, স্যান্ডম্যান, জ্যাক্‌ল প্রমুখ।

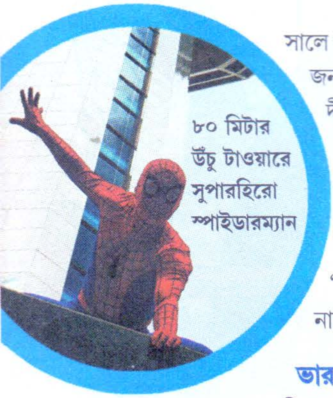
**সিনেমায় স্পাইডারম্যান:** ২০০২ সালে স্পাইডারম্যানের প্রথম সিনেমাটি মুক্তি পায়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন টোবি মেগর। দু'বছর পর 'স্পাইডারম্যান টু' মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবিতেও স্পাইডারম্যান-এর অভিনয় করেন টোবি। দুটি ছবিরই পরিচালক ছিলেন স্যাম রাইমি। টিভিতেও দেখা গিয়েছে স্পাইডারম্যানকে।



স্পাইডারম্যানের পোশাকে রোবো-ডগ (ডান দিকে)

**ভিডিও গেম:** স্পাইডারম্যান কমিক্‌স এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, স্পাইডারম্যানকে নিয়ে প্রকাশিত হয় বেশ কিছু ভিডিও গেম। ১৯৮২

# স্পাইডারম্যান



৮০ মিটার উঁচু টাওয়ারে সুপারহিরো স্পাইডারম্যান

সালে প্রথম গেমটি বেরোয়। খুব জনপ্রিয় হয় গেমটি। তারপর দীর্ঘদিনের বিরতি। ২০০৪ সালে বেরলো স্পাইডারম্যান টু ভিডিও গেম। এ-বছর সেপ্টেম্বর মাসে এসেছে 'আল্টিমেট স্পাইডারম্যান' নামে আর-একটি গেম।

**ভারতে স্পাইডারম্যান:** শুধু বিদেশে নয়, এদেশেও স্পাইডারম্যানের ভীষণ জনপ্রিয়তা। ছোট ছেলেমেয়েদের তো বটেই, স্পাইডারম্যান বড়দেরও প্রিয়। মাকড়সার মতো খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠা, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিপদের মোকাবিলা করা, দেখতে-দেখতে চোখের পলক পড়ে না দর্শকদের। শত্রু সাবধান হওয়ার আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মাকড়সার জাল ছুড়ে ধরাশায়ী করে দেয় তাকে। ভারতীয় ধাঁচে স্পাইডারম্যান প্রকাশ করা শুরু হয়েছে ২০০৪ সাল থেকে। গায়ের জোর আসল স্পাইডারম্যানের মতোই। তবে কস্টিউমের সঙ্গে সে ধুতিও পরে। থাকে মুম্বই শহরে। নাম পবিত্র প্রভাকর। কাকা-কাকিমার নাম ভারতীয় সংস্করণে ভীম এবং মায়া। প্রধান শত্রু নলিন ওবেরয়। ভারতীয় স্পাইডারম্যানের গল্প লিখেছেন শরদ দেবরাজন ও ছবি এঁকেছেন জীবন কাং।



ডগ রেসে স্পাইডারম্যান সেজেছে এই কুকুরটি



স্পাইডারম্যান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টোবি মেগর

# ভবশংকরের গোয়েন্দাগিরি

## সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়



করিমপুর গ্রামের ইন্দু আজ ইন্দ্রনারায়ণ। সে যে আজ বেসরকারি ফার্মের একজন এগ্‌জিকিউটিভ, তার মূলে ডাক্তার হরিশংকর ব্যানার্জি, মানে ভবার বাবা। করিমপুরের নামী ডাক্তার হরিশংকরবাবুর বদান্যতাতেই শৈশবে মা-বাবা হারানো ইন্দু আজ বেঁচেবর্তে আছে। পিতৃতুল্য ডাক্তারবাবু মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। ইন্দ্র এখন কর্মসূত্রে কলকাতায়। ডাক্তারবাবুর একমাত্র সন্তান ভবা ইন্দ্রর চেয়ে বছর আষ্টেকের ছোট। সেই ভবাই যখন ইন্দ্রকে জরুরি তার করল করিমপুরে আসার জন্য, ইন্দ্র তা ফেলতে পারল না। ব্যাচেলর ছেলে ইন্দ্র। তার সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে রওনা হল তৎক্ষণাৎ।

বহুদিন পরে করিমপুরে পা দিয়ে ইন্দ্র দেখল, অনেক পালটে গেছে করিমপুর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, নতুন-নতুন বাড়িঘর আর দোকানপাটে একটা রীতিমতো মফস্‌সল শহরের রূপ নিয়েছে।

ভবাদের বাড়িতে পৌঁছে ইন্দ্র জানতে পারল ব্যাপারটা। ডাক্তারজেঠিমা রোগশয্যায়, উচ্চ-রক্তচাপের রুগি তিনি। তার উপর ছোটখাটো একটা সেরিব্রাল অ্যাটাকও হয়ে গেছে সম্প্রতি। ইন্দ্রকে কাছে ডেকে নিয়ে ভবার দেখাশোনার কথা জানাতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদেই





ফেললেন তিনি। ইন্দ্র যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে জেঠিমাকে চিন্তামুক্ত হতে বলল। ইন্দ্রর আশ্বাসে উনি যেন কিঞ্চিৎ শান্তি পেলেন বলেই মনে হল।

পরদিন ইন্দ্র পড়ল ভবাকে নিয়ে। ভীষণ একগুঁয়ে প্রকৃতির। চেহারাটা চলনসই হলেও বুদ্ধি তার খুব একটা নেই বললেই চলে।

ভবার ইচ্ছে ডিটেকটিভ হওয়ার, কিরীটি রায় অথবা প্রদোষ মিত্তির ওরফে ফেলুদার মতো সত্যানুসন্ধানী হতে চায় সে। ইন্দ্র অনেক চেষ্টা করল ভবাকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু ভেবেই পেল না, ভবাকে সে কীভাবে বোঝাবে, প্রকৃত ডিটেকটিভ হতে গেলে শুধু সাহস বা চেহারাটাই শেষ কথা নয়, মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুরও কিছুটা দরকার। এ ছাড়া গোয়েন্দাগিরির বিপদের ঝুঁকির দিকটা তো রয়েছেই।

কিন্তু ভবা একরোখা। সে যখন স্থির করেছে গোয়েন্দা হবে, তাকে আটকানো দুঃসাধ্য, অসাধ্যও বলা যায়। অগত্যা, কোনও উপায় না দেখে ইন্দ্র ভবাকে পরামর্শ দিল, বাড়ি থেকে পালানো, হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ছোটখাটো কেস দিয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে। পরে, একটু অভিজ্ঞতা বাড়লে, খুনোখুনিতে যাওয়া যাবে'খন। ছেলেটা একমাত্র ইন্দ্রর কথাই তবু কিছুটা শোনে, মেনেও নিল। ইন্দ্র ভাবে, শুরুই করুক না, কিছুদিনেই মিটে যাবে শখ। তা ছাড়া কার সাফল্য কোনদিক থেকে আসে, কে বলতে পারে!

করিমপুর থেকে ফিরে এসেছে ইন্দ্র, তা প্রায় মাসদুয়েক হয়ে গেছে। সেদিন ছিল শনিবার। অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে ইন্দ্র। দ্যাখে, ভবা এসে হাজির। "কী খবর শার্লক হোমস? গোয়েন্দাগিরি কেমন চলছে?" ইন্দ্র জানতে চায়।

"আর বোলো না ইন্দ্রদা, কোনও একটা কেস পেলে দেখিয়ে দিতে পারতাম আমার কেরামতি। ডেলি নিউজ পেপার 'ভোরের খবর'-এ দু'-দু'বার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিলাম, একটাও কেস এল না। আসলে, আমার নামটাই হয়েছে কাল।" বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ভবা।

"কীরকম?" বেশ মজাই অনুভব করে ইন্দ্র, বেচারার দুর্দশা দেখে।

"জানো, প্রথমবার বিজ্ঞাপনে লিখলাম 'সত্যান্বেষী ভবশংকর ব্যানার্জি। হাটগাছা, করিমপুর। হারানো-প্রাপ্তিতে ধন্বন্তরি। যোগাযোগ করুন।' তা, একটাও মক্কেল এল না। মনে হয়, পাড়ার লোক আমার ভাল নামটা জানেই না। সবাই জানে, ভবা। তোমাদের কলকাতার মতো বাড়ির নম্বর তো নেই। কী যে অসুবিধে!"

"আর দ্বিতীয়বার কী দিয়েছিলি বিজ্ঞাপনে?" প্রশ্ন করে ইন্দ্র।

"দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের মতোই সব লিখেছিলাম, শুধু নামের শেষে ব্র্যাকেটে দিয়েছিলাম আমার ডাকনাম, ভবা। মনে হয়, এই ডাকনাম দেখেই কোনও মক্কেল এ-মুখো হয়নি।"

"তা হলে এক কাজ কর, তুই জেঠিমাকে নিয়ে আমার এখানেই চলে আয়," প্রস্তাব দেয় ইন্দ্র।

"না-না, তা সম্ভব নয়, মা কিছুতেই রাজি হবেন না। আর, আমিও বাবার ভিটে ছেড়ে চলে আসব, তা কী হয়! তুমিই বলো!"

না, শখের গোয়েন্দাগিরি ভবার মোটা মাথাটাকে পুরোপুরি ছড়কে দেয়নি, মনে-মনে ভাবে ইন্দ্র।

"তা হলে বরং এক কাজ কর, একটা নতুন বিজ্ঞাপন দে, ভোরের খবর দৈনিকেই। লিখবি, 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সত্যান্বেষী শ্রী ভবশংকর ব্যানার্জি মাত্র ছ'মাসের জন্য করিমপুর হাটগাছায়। যে-কোনও হারানো কেসে অব্যর্থ। যোগাযোগ করুন ডা: হরিশংকর ব্যানার্জির একমাত্র পুত্র ভবার সঙ্গে'," ইন্দ্র বাতলায়।

"কিন্তু আমি তো একটা কেসও এখনও ধরিনি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলাম কী করে?" অধৈর্য ভবা।

"বিজ্ঞাপনে ওরকম লিখতে হয় পপুলারিটির জন্য," গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় ইন্দ্র।

"তা না হয় হল, কিন্তু..."

"কোনও কিন্তু নয়। যেসব মক্কেল ভবশংকর ব্যানার্জির খোঁজে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসবে, তুই তাদের একদিন বা দু'দিন পরে যে-কোনও একটা সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবি, আর নিজেই কোট, প্যান্ট, টাই পরে মানে, সুটেডবুটেড হয়ে চোখে গগল্‌স, নকল গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লাগিয়ে মেকআপ নিয়ে বসে থাকবি। ব্যস, কেউই চিনতে পারবে না যে, তুই-ই ভবা।"

এতক্ষণে বোধগম্য হয় ব্যাপারটা ভবার। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে।

"হেভি প্ল্যান দিয়েছ তো ইন্দ্রদা। সত্যি, তোমারই গোয়েন্দা হওয়া উচিত ছিল," না বলে পারে না ভবা।

"দূর বোকা, আমার এই কুমড়োপটাশ চেহারা নিয়ে কি গোয়েন্দাগিরি হয়?" আক্ষেপের সুরে বলে ইন্দ্র। আরও বলে সে পরামর্শের ভঙ্গিতে, "দ্যাখ, অতি অবশ্যই হারানো কেসের একটা রেজিস্টার রাখবি। তালিকা করে নিবি তাতে। নাম, বাবার নাম, বিবরণ, উচ্চতাটুচ্চতা—সব ঠিকঠাক নোট করে নিবি। আর হ্যাঁ, সাম্প্রতিককালের তোলা একটা পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ, রঙিন হলেই ভাল হয়, চেয়ে নিবি মক্কেলের কাছ থেকে। মক্কেলকে একটা দরখাস্ত দিয়ে লোকাল থানায় মিসিং ডায়েরি করতে বলবি। আর, তুই নিজে কেসটা নিয়ে মিসিং পার্সন্‌স স্কোয়াড, ভবানীভবনে সরাসরি যোগাযোগ করবি। আমার এক অফিসার বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব'খন। উনিই তোকে বিস্তারিত ইনফরমেশন দিতে পারবেন।"

ইন্দ্রর কাছ থেকে বিস্তারিত পরামর্শ নিয়ে ভবা নাচতে-নাচতে বাড়ি ফিরে গেল। পরের রবিবার ভোরের খবর দৈনিকে দেখা গেল বেশ বড় করেই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোয়েন্দা শ্রী ভবশংকর ব্যানার্জি..' ইত্যাদি।

'না, ইন্দ্রদার অসীম বুদ্ধি। আমি-ই ভবশংকর ব্যানার্জি আবার আমিই ভবা! একই লোক কিন্তু দু'টো আলাদা চরিত্র। গোয়েন্দাগিরির শুরুতেই ছদ্মবেশ ধারণ। ওঃ, কী থ্রিলিং,' ভাবতে থাকে ভবা।

"আচ্ছা আপনিই কি ডাক্তারবাবুর ছেলে ভবা?" মাঝবয়সি এক দেহাতি ভদ্রলোকের ডাকে ছিন্ন হয় ভবার ভাবনা।

"হ্যাঁ, আমার নিজেরও তো তাই বিশ্বাস," চিন্তা ছিন্ন হওয়ায় ভবার বিরক্তিমেশানো উত্তর।

"তা, আমি ভবশংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ভবশংকরবাবুর সঙ্গে?" ভদ্রলোকের

মুখের কথা কেড়ে নেয় উৎসাহিত ভবা, "কাল আসবেন সন্ধে সাতটায়। ওই বাঁ দিকের ঘরে পাবেন ওঁকে," ইন্দ্রর পরামর্শের বাইরে একটি শব্দও খরচ করে না ভবা।

ভদ্রলোক বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, "কাল সন্ধে সাতটায়! আজ কোনওমতে একটু দেখা হবে না?"

আজ এখনই, এ-মুহূর্তেই দেখা হতে পারে, বলতে গিয়েও নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নেয় ভবা। চট করে বলে দেয়, "না-না, উনি একটু ভ্রমণে বেরিয়েছেন। মাদাগাস্কার গেছেন, কাল সন্ধে নাগাদ ওঁর দেখা পাবেন।"

চিন্তিত ভদ্রলোক ফিরে যান টাকমাথা চুলকোতে-চুলকোতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ভবা। ভাবতে থাকে, আর-একটু হলেই ইন্দ্রদার সব প্ল্যান ভেস্তে যেত! ভাগ্যিস মাদাগাস্কার শব্দটা ওর মাথায় এসে গিয়েছিল।

সেদিন সারারাত ঘুম হল না রোমাঞ্চিত ভবার। পরের দিনও সকাল-দুপুর যেন কাটতেই চায় না। বিকেল পাঁচটা থেকেই দরজা-জানলা বন্ধ করে মেকআপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভবা। দাড়িগোঁফ সব আগে থেকেই জোগাড় করে রেখেছিল। বাবার কোট-প্যান্ট-টাই নিয়ে সুটেডবুটেড হয়ে নকল গোঁফদাড়ি লাগিয়ে সে বাবার চেম্বারেই বসে পড়ল। মুখে বাবার চুরুটটা লাগিয়ে সামনের টেবিলে ফাইল আর কলম নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধে ঠিক সাতটায় দরজায় টোকা পড়তেই সে বলল, "কাম ইন, ভিতরে আসুন।"

সেদিনের সেই টাকমাথা, ধুতি-পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোক, মুখে একটা সর্বস্বান্তভাব। ভবা, মানে ভবশংকর ব্যানার্জি আগে থেকেই টেবিল ল্যাম্পের ফোকাসটা সামনের দিকে রেখেছিল। আর সেই আলোয় আলোকিত তার মক্কেলের চোখে ধাঁধা লাগার মতো অবস্থা। কোনওরকমে তিনি ওপাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন, আর রাম নাম জপতে লাগলেন। কারণ, আবছা আলো-আঁধারির খেলায় ভবশংকরকে তখন জ্যান্ত ভূতের মতোই লাগছে।

গম্ভীর ভবশংকর ফাইলটা টেনে নিয়ে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে, "নাম?"

"আজ্ঞে, অধীনের নাম ধূর্জটি ঘোষ," কাঁপা-কাঁপা গলায় উত্তর দেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

"আপনার নয়, যে হারিয়েছে তার নাম কী?"

"আজ্ঞে, কালী।"

"কালী! সে আপনার ছেলে না মেয়ে?" প্রশ্ন করে ভবশংকর।

"আজ্ঞে, তা নয়। ওই আমার ছেলের মতো," আধো-আধো উত্তর ঘোষমশাইয়ের।

"ছেলের মতো আবার কী? বলুন, ছেলে," জোর ধমক দেয় ভবা ওরফে ভবশংকর।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"বয়স?"

"আজ্ঞে, আড়াই বছর।"

"হুঁ," দুই প্লাস, গম্ভীরভাবে টুকে নেয় ভবশংকর, ধূর্জটি বানানটা লিখতে হয়নি বলে কিছুটা হাঁফ ছাড়ে। পিতার নামের জায়গায় সে সংক্ষেপে ডি ঘোষ লিখে নিয়েছে।

"উচ্চতা?" আবারও তার প্রশ্ন।

"আজ্ঞে উচ্চতা? তা প্রায় ধরুন দু'হাত।"

দু'হাত, মনে-মনে একটু হিসেব করে উচ্চতা টুকে নেয় ভবশংকর। একেবারে গাঁইয়া, ফুট-মিটারের হিসেব জানে না, ভাবে সে।

"ঠিকানা?"

"আজ্ঞে, কমলপুর, ৫ নম্বর খাটাল।"

"তা, বাড়ি থেকে পালাল কেন? মারধোর করেছিলেন নাকি?" কাগজ থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে ভবশংকর।

"আজ্ঞে না, মারধোর তেমন কিছু করিনি। আর, ওইটুকু দুধের শিশুকে মারতেই বা যাব কেন বলুন?"

"তা ঠিক! তা, পালানোর সময় পরনে কী ছিল?"

"আজ্ঞে, পরনে মানে?" আমতা-আমতা করেন ঘোষমশাই।

"পরনে মানেও বোঝেন না। দুধের শিশু বলে একেবারে উদোম করে রাখতেন নাকি! এই শীতে গরম জামাকাপড় কিছু পরাতেন নিশ্চয়ই?"

"আজ্ঞে, তেমন কিছু তো আর পরাতে পারিনি স্যার, ওই রাত্তিরটুকু শুধু চট দিয়ে দিতুম গায়ে।"

"সে কী মশাই! কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর





বাবা আপনি!"

"আজ্ঞে," বলেই থেমে যান ঘোষমশাই, এক গভীর অপরাধবোধে তিনি মুখ নিচু করে থাকেন। কষ্টে, দুঃখে চোখ দু'টো তাঁর ছলছল করতে থাকে।

"তা, সিনেমাটিনেমায় নিয়ে যেতেন তো? ভাল নাটক, থিয়েটার বা ছোটদের উপযোগী যাত্রাপালায়? এই শীতে জাদুঘর, তারামণ্ডল, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, কিংবা ধরুন নিক্কো পার্ক, বাইপাসের ধারে সায়েন্স সিটি, এনার্জি পার্ক, গঙ্গার পারে মিলেনিয়াম পার্ক—কোথাও ঘুরিয়ে এনেছেন ওকে?"

"না, তেমন কিছু নয়। মানে, ওই রেলপারের মাঠ পর্যন্ত।"

"কী বললেন? রেলপারের মাঠ? আহা, কী বেড়ানোর জায়গা! ধন্যি মশাই। ছেলেপুলে নিয়ে ছেলেখেলা! বুঝতে পেরেছি। জামাকাপড় পরাতেন না। কোথাও ঘুরতেও নিয়ে যেতেন না। তা, ঠিকমতো দু'বেলা খেতেটেতে দিতেন তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ওই গরিবের ঘরে যা জোটে—খড়, ভুষি, খোল আর মাঠের ঘাস।"

"আর মাছ, ডিম, মাংস? সপ্তাহে না পারেন মাসে দু'-একবার?" মুড়ের মাথায় প্রশ্ন করে যায় ভবশংকর।

"স্যার, গোরু-বাছুরকে মাছ, মাংস খাওয়াব? কী যে বলেন আপনি!" এতক্ষণে মুখ খুলতে সাহস পান ধূর্জটি ঘোষ।

"বাছুর? তাতে কী হয়েছে! বাছুর বলে কি তার শখ-আহ্লাদ কিছুই থাকতে নেই? তা ছাড়া বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই আপনাকে যদি আমি খড়, ভুষি, খোল, ঘাসপাতা খাওয়াই, পারবেন মুখ বুজে পড়ে থাকতে? বিদ্রোহ করে পালাবেন না একদিন?" বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে ভবশংকর।

ভবশংকরের বলার দাপটে বেশ কিছুটা চাপা পড়ে যান আগন্তুক ধূর্জটি ঘোষ। আমতা-আমতা করে বলেন, "হ্যাঁ, তা যা বলেছেন স্যার। তবে বলছিলাম কী, কালী আমার পালায়নি স্যার। সে ওরকম অবাধ্য ছেলে নয়। ও নির্ঘাত চুরি গেছে। এ স্যার ওই খালপাড়ের বটা ঘোষের কীর্তি।"

"চুরি গেছে না ছাই গেছে। আলবাত পালিয়েছে। পালিয়ে ভূত হয়ে গেছে আপনার কালী। এসব বটাফটা কিছু নয়। আপনি তাকে ভালমন্দ খেতে-পরতে দেবেন না, বছরের শেষে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবেন না, আমোদ-আহ্লাদের কোনও ব্যবস্থা নেবেন না! আর, সে বাছুর বলে কি মানুষ নয়! মনে রাখবেন, দিনকাল পালটাচ্ছে," দীর্ঘ সংলাপ বলে উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে ভবশংকর ওরফে ভবা।

"তা, থানায় ডায়েরি করেছেন? জ্বলজ্যান্ত ছেলেটা পালিয়ে গেল, আর কিছু না-পারুন বাবা হিসেবে এটুকু নিশ্চয়ই করেছেন?" আবারও প্রশ্নের বাণ নিক্ষেপ করে ভবশংকর।

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে বলে, "স্যার, ডায়েরি করতেই তো গিয়েছিলাম থানায়। দারোগাবাবু ডায়েরি নিলেন না।"

"কেন? ডায়েরি নিলেন না কেন?"

"দারোগাবাবু বললেন, 'ওসব গোরু-বাছুরের কেস আমরা নিই না,' " বলেন ভদ্রলোক।

"যেমন বাবা, তেমনই দারোগা," মন্তব্য উত্তেজিত ভবশংকরের। সে আরও বলে, "একজন বাবা, ছেলে বাছুর বলে তাকে জামাকাপড় পরাবে না, ভালমন্দ খেতে দেবে না, কোথাও বেড়াতে পর্যন্ত নিয়ে যাবে না! আর অন্যজন দারোগা, যে কিনা শান্তিরক্ষক, শুধুমাত্র বাছুর বলে নিরুদ্দেশের ডায়েরি লিখবে না! কী আশ্চর্য, ভয়ংকর সব কথা। যে দেশে গোরুর বাচ্চাদেরই এই অবস্থা, সেখানে মানুষের বাচ্চার অবস্থা যে কী, ভাবতেও ভয় হয়," চিন্তিত হয়ে পড়ে ভবশংকর।

"যাই হোক, একটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটো নিয়ে আসবেন মশাই," হঠাৎই ইন্দ্রর পরামর্শ মনে পড়ে যায় ভবশংকরের।

"আজ্ঞে কার, আমার?" বিনীত প্রশ্ন ঘোষমশাইয়ের।

"আপনার? আপনার ফোটো দিয়ে কী হবে? আপনি কি হারিয়েছেন নাকি, মহা ঝামেলা!" ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে ওঠে ভবশংকর।

"কিন্তু ওর ফোটো তো তোলা নেই স্যার।"

"তোলা নেই তাতে কী হয়েছে? একটা নতুন তুলে নিয়ে আসবেন," নির্লিপ্ত গলায় পরামর্শ দেয় ভবশংকর।

"কিন্তু ওকে তো স্যার পাওয়াই যাচ্ছে না!"

"পাওয়া তো যাবেই না, বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে কাউকে কি পাওয়া যায়? তা বলে ফোটো তুলতে বাধা কোথায়? কী যে যা-তা বলেন। ওই চটা ঘোষ না কী যেন নাম বললেন?"

"চটা ঘোষ নয় স্যার, বটা ঘোষ।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, বটা ঘোষের খাটালে গিয়েই না হয় তুলে নিয়ে আসুন আপনার কালীর ফোটো, তারপর আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন? সঙ্গে দু'শোটা টাকা আনবেন। একশো টাকা আমার ফিস, আর একশো টাকায় নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আর ইন্দ্রদার কথামতো আমাকে ভবানী ভবন যেতে হবে। সে অনেক ঝামেলা, আপনি বুঝবেন না। দেখুন, ভোরের খবর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ফোটোটা কিন্তু আমার চাই-ই চাই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলে নমস্কার করে বেরিয়ে যান ধূর্জটি ঘোষ।

কারও বাবা এমন নিষ্ঠুর হতে পারে, এর আগে জানা ছিল না ভবশংকরের। সে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে বসে-বসে ভাবতে থাকে দেশের ভয়ংকর এই পরিস্থিতির কথা।

আরও দু'সপ্তাহ কেটে গেল। ধূর্জটি ঘোষের টিকিও দেখা গেল না। অধৈর্য হয়ে সোজা ইন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল ভবা ওরফে ভবশংকর।

"কী ব্যাপার, কেমন চলছে গোয়েন্দাগিরি?"

ইন্দ্রর প্রশ্নের উত্তরে সব ঘটনা বিস্তারিত জানায় ভবশংকর।

ভবার বোকামিতে দমফাটা হাসি পেলেও তা প্রকাশ করে না ইন্দ্র। বলে, "দুর বোকা, তুই ওঁর থেকে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিলি না কেন? আমরা ওঁর কালীর মতো দেখতে অন্য একটা বাছুর না হয় গো-হাটা থেকে কিনে এনে ওঁকে দিতাম। শ'তিনেক টাকা দাম পড়ত। গোয়েন্দা হিসেবে ভদ্রলোক তোর নামও করতেন খুব।"

টাকা নয়, নামের কথা শুনেই আনন্দিত হয় ভবা। মনে-মনে নিজের ভুলও বুঝতে পারে। লোকটার সঙ্গে

এতটা রুক্ষ ব্যবহার না করলেও চলত। আসলে, সন্তানের প্রতি এতটা অবহেলা, মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে।

সেদিনের মতো ইন্দ্রর কাছ থেকে ফিরে এল ভবা। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, এমন ভুল সে আর করবে না। ইন্দ্রদার কথামতোই সে এবার থেকে চলবে।

ইন্দ্রদার বাড়ি থেকে ফেরার ঠিক তিন দিনের মাথায় এক কেতাদুরস্ত মাঝবয়সি ভদ্রলোক এসে কড়া নাড়লেন, "ভবাবাবু বাড়ি আছেন?"

ঠিক আগের মতোই ভবা ওরফে ভবশংকর তার নিজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য পরের দিন আসতে বলল ভদ্রলোককে।

পরের দিন ভবা আবার সেই ধোপদুরস্ত ভবশংকর। ভদ্রলোককে সামনের চেয়ারে বসতে বলায় ভদ্রলোক ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে, টেবিলে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসের জল ঢকঢক করে খেয়ে শেষ করে ফেললেন। তারপর তিনি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ভবশংকর বলে ওঠে, "আপনার হারানো কেস তো?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ," ভদ্রলোক উত্তর দেন আকুল হয়ে।

"আড়াই বছর তো!" ভবশংকর বয়সটাই জানতে চায়।

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আ-আপনি জানলেন কী করে?" হতবাক ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

*ঠোঁটের কোনায় রহস্যের হাসি* খেলিয়ে দেয় ভবশংকর। ভাবটা এমন, যেন তার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোয়েন্দা এই সামান্য ব্যাপারটা জানবে না!

ভদ্রলোক বলেন, "আপনি তো মশাই সবই ধরতে পারেন দেখছি! তবে কিনা অনেক পয়সা দিয়ে কিনেছিলাম, খুব পয়মন্তও ছিল। চুরি যাওয়ার পর থেকে, বুঝতেই পারছেন!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা," ভদ্রলোককে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে ভবশংকর। কেসটা সে স্রেফ হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। চুরি যাওয়া হিসেবে দেখতে চায় না। ভদ্রলোকের পয়সা দিয়ে কেনার মন্তব্যটাও ভাল লাগে না, বরং ভদ্রলোক বলতে পারতেন, বাছুরটা ওঁর দত্তক নেওয়া। তবে, পয়মন্ত কথাটা গোরু-বাছুরের ক্ষেত্রে খুবই খাঁটি, ভাবে ভবশংকর। দুধ, চামড়া, মাংস, শিং এমনকী, গোবর আর চোনা পর্যন্ত। দুধের গুণাগুণ তো গুনেও শেষ করা যায় না, আর চামড়া? সে শুনেছে, পৃথিবীতে যত রকম জুতো তৈরি হয় সবই নাকি গোরুর চামড়ায়। সাদা গোরুর চামড়ায় সাদা জুতো, আর লাল গোরুর চামড়ায় লাল জুতো, এই যা তফাত। বাড়ি শুদ্ধি করতে গোবর, কেউ কোনও পাপ করলে তো কাঁচকলা, তুলসী-চোনা-গোবর আর গঙ্গাজল বেশ ভাল করে চটকে মেখে খাইয়ে দাও, হয়ে গেল প্রায়শ্চিত্ত। বিশুদ্ধ জ্বালানি, তাতেও গোবর। পেট্রোল, ডিজেলের পরিবর্তে গোবর দিয়ে নাকি এরোপ্লেন, রকেট পর্যন্ত চালানো হচ্ছে। যদিও সে শুনেছে পৃথিবীর সব চিরুনিই গোরুর শিং দিয়ে তৈরি। ব্যাপারটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি সে। মানুষকে গুঁতনো ছাড়া ওই দু'টো বিদঘুটে জিনিসের আর কোনও কাজ আছে বলে তার মনেই হয় না। ও দু'টো গোরুর না থাকলেই বরং ভাল হত। যা হোক, এহেন গোরুর চেয়ে পয়মন্ত আর কী-ই বা আছে!

আলো-আঁধারির মধ্যে ভবশংকরের দীর্ঘ নীরবতায় অধৈর্য হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক।

"আপনাকে কী বলব স্যার, এক হাজার টাকা পর্যন্ত আমি দিতে রাজি আছি। যদি একটু দয়া করে উদ্ধার করে দেন।"

"না-না চিন্তা করবেন না," আশ্বাস দেয় ভবশংকর, "এক হাজার টাকাও লাগবে না, মাত্র পাঁচশো টাকায় আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি শুধু এবার বাছুরটার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন তো। বলুন, সাদা না কালো?"

ভবশংকরের প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক আঁতকে ওঠেন, "বাছুর? কী বলছেন মশাই?"

ভবশংকর ভদ্রলোকের অস্থিরতায় খুব বিরক্ত হয়। বলে, "দেখুন, পাঁচশোর কমে আমি কিছুতেই পারব না। ইন্দ্রদা বলেছে যে, গো-হাটায় গিয়ে কিনে আনতে হবে। শ'তিনেক টাকা পড়বে। বুঝতেই পারছেন, যাতায়াত, অন্যান্য





খরচ, ভোরের খবর দৈনিকে বিজ্ঞাপন— এসব নিয়ে আরও একশো। তা হলে হাতে রইল সাকুল্যে মোটে একশো টাকা। না-না, ওর কমে আমি কোনওমতেই পারব না মশাই," খোলসা করে ভবশংকর।

ভদ্রলোক এবার চিৎকার করে ওঠেন, "আড়াই বছর আগে নগদ পাঁচ হাজার টাকায় কেনা দেবীমূর্তি সোনা আর ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। আমার এমন পয়মন্ত, তাকে আপনি বেমালুম বাছুর বানিয়ে দিলেন? গো-হাটা থেকে তিনশো টাকায় কিনে এনে দেবেন? এ কী ভোজবাজি নাকি? গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়ে জাদুগিরি শুরু করুন মশাই," বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের ব্যবহারে ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ভবশংকর। হতে পারে ওটা দেবীমূর্তি, তা বলে কেষ্টর জীব রাছুরও বড় একটা ফেলনার নয়। এত তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কী আছে। এরকম হীন মনোবৃত্তির লোক আগে বোধ করি দেখেনি সে। এ লোকটা যদি এর পরে কোনওদিন এসে ওর হাতেপায়েও ধরে, লোকটার কেস নেবে না, ভাবে ভবশংকর।

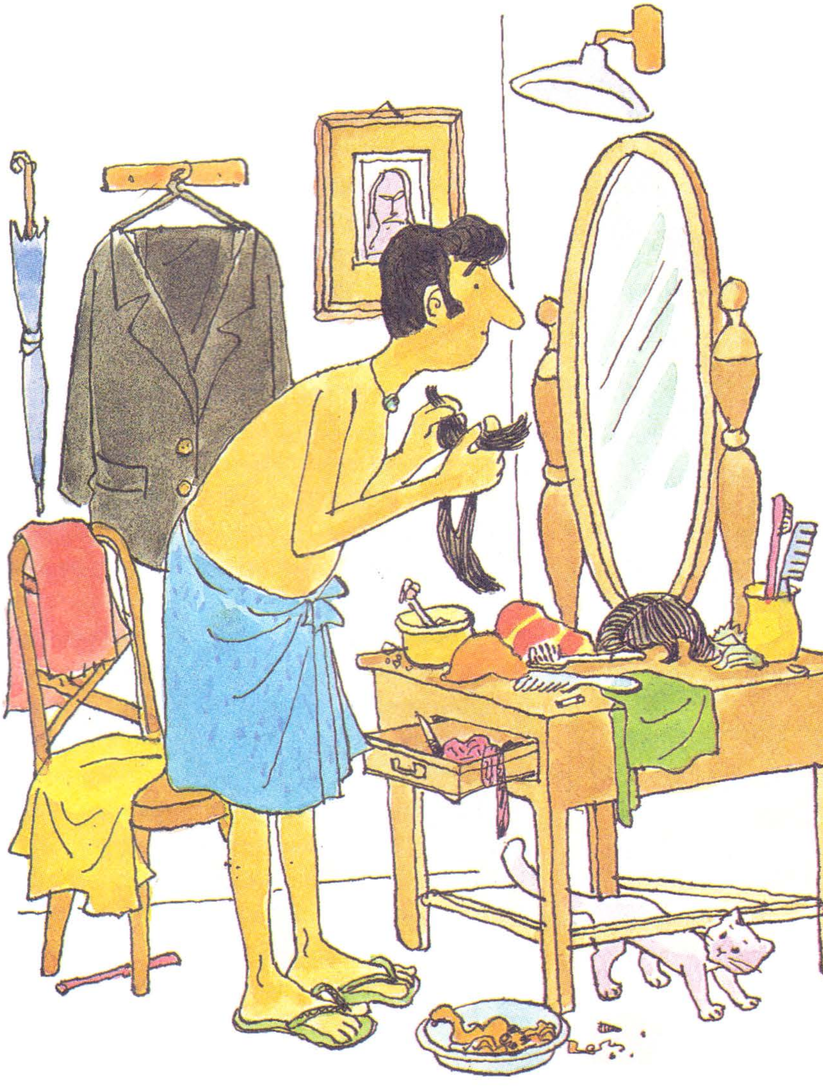
পরের রবিবার ভবশংকর ইন্দ্রদার সঙ্গে দেখা করতে গেল। যথেষ্ট ক্ষোভের সঙ্গেই বলল সে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। ইন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল, "এবারও বোকামো করলি ভবা? লোকটা যখন হীনমনোবৃত্তির, একটা দাঁও মারতে পারতিস। লোকটা যখন হাজার টাকার অফার দিয়েছিল, তখনই যদি রাজি হয়ে যেতিস, তবে কলকাতার কোনও কিউরিও-র দোকান থেকে একটা নকল দেবীমূর্তি কিনে দেওয়া যেত। পাঁচ-সাতশো টাকাতেই হয়ে যেত।"

আবারও নিজের বোকামিতে লজ্জিত হয় ভবশংকর। ফিরে আসে নিজের বাড়িতে। বেশ কয়েকদিন কেউই এল না। কিছুটা মুষড়ে পড়ল ভবশংকর ওরফে ভবা।

অবশেষে এক মালদার মক্কেলের দেখা মিলল। এবার পরিকল্পনা অনুসারেই প্রস্তুত ভবশংকররূপী ভবা।

সন্ধে সাতটায় আসতে বলেছিল সে। পৌনে সাতটাতেই ভবশংকর বেশভূষা পরে বসে রইল বাবার চেম্বারে। ঘড়ির কাঁটা ঠিক সাতটা ছুঁইছুঁই, ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল সেই লোকটা। আগের দিন যার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি, আজ তার পরনে কোট-প্যান্ট-টাই-জ্যাকেট, এমনকী, মাথায় একটা ঢাউস হেলমেট।

এ লোকটা কি ধরতে পেরে গেল ওর কলাকৌশল? গোয়েন্দার সঙ্গে-সঙ্গে মক্কেলও কি ছদ্মবেশ ধারণ করেছে?



ভাবিত হয় ভবশংকর। যাই হোক, সাহসে ভর করে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ বলুন, আপনার কী ব্যাপার?"

"ব্যাপার? ব্যাপার আবার কী মশাই, একেবারে কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড!"

"হারিয়ে গেছে তো? তাই না?" সবজান্তার ভঙ্গিতে জানতে চায় ভবশংকর।

"হারিয়ে গেছে কী বলছেন মশাই, আমাকে একেবারে পরাজিত করেই গেছে। আমি একেবারে হেরে ভূত হয়েই গেছি, বলা যায়," ঝাঁটা গোঁফে টাকমাথা লোকটার অকপট স্বীকারোক্তি।

"তা বটে, ভূতের মতোই আপনি, কিন্তু কী হারিয়েছে আপনার?" কোনও চান্স না দিয়ে প্রথমেই জেনে নিতে চায় ভবশংকর। বারবার তিনবার একই ভুল করতে নারাজ সে।

"তা ধরুন, আপনি একটা বাঁদর, একেবারেই বাঁদর বলতে পারেন," জবাব দিলেন খ্যাঁড়ামুখো।

ভূত না বাঁদর, কোনটা বেশি বিতিকিচ্ছিরি ভেবে উঠতে পারে না ভবশংকর। "কী বললেন আপনি, আমি একটা বাঁদর!" গর্জে ওঠে সে।

"তা ধরুন বাঁদর ছাড়াই বা কী, না হলে ছাদের পাশের কয়েতবেল গাছ বেয়ে এভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় কেউ?" নিজের কথাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান নবাগত ভদ্রলোক।

"দেখুন, বাড়ি বয়ে এসে মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে এরকম অপমানজনক সম্বোধন খুব একটা ভদ্রলোকের কাজ নয়," ভদ্রলোককে ভবশংকরের বিনীত ভর্ৎসনা।

বেপরোয়া ভদ্রলোক কোনও বাধা না মেনেই বলে চলেন, "আপনি কি শুধুই বাঁদর, একেবারে দুধকলা দিয়ে পোষা বাঁদর! আমার গিন্নিই এর মূলে, বুঝলেন না! কতদিন বলেছি, গিন্নি, বাঁদরটাকে দুধকলা দিও না। তা, কে শোনে কার কথা।"

"দুধকলা দিয়ে তো কালসাপ পোষে জানি, প্রায় বাড়িতেই। কিন্তু দুধকলা দিয়ে বাঁদর পোষা, এ কিন্তু আপনার কাছেই প্রথম জানলাম," বিনীতভাবে বলে ভবশংকর, ভদ্রলোকের বাঁদরামোকে ক্ষমা করেই।

"তবে আর কী বলছি মশাই, এই ধরুন না, আপনি একটা মহাবাঁদর। ইশকুল থেকে ফিরলেন, আর আমার গিন্নি অমনই আপনার মুখে দুধকলার বাটি ধরল। আপনিও চুকচুক করে দুধকলা খেয়েই সোজা খেলার মাঠে। না পড়াশোনা, না কথা শোনা।"

বাঁদররা দুধকলা চুকচুক করে খায় কিনা, ঠিক জানা নেই ভবশংকরের। এই সন্দেহের নিরসন করে উঠতে পারে না সে। ফলে ভদ্রলোক একেবারে খোলা মাঠ পেয়ে বলেই চলেন।

"তা হলেই বলুন, আমি হাড়ভাঙা খেটে পয়সা উপার্জন করলাম, আর আপনি এমনই বাঁদর যে, পড়াশোনা সব লাটে তুলে দুধকলা খেয়েই কাটিয়ে দিলেন। কার সহ্য হয় এসব বাঁদরামো!"

"তা তো ঠিকই," ভদ্রলোকের ক্ষুরধার যুক্তিকে সমর্থনই জানায় ভবশংকর।

"সেইজন্যই তো দিলুম আটকে ছাদের ঘরে, একেবারে তালাচাবি মেরে। এই যে দেখুন, দেখুন তো চিনতে পারেন কি না। এই সেই তালাচাবি," ব্যাগ থেকে ঢাউস একটা তালা আর প্রমাণ সাইজ়ের চাবি বের করে দেখান ভদ্রলোক।

দেখবার মতো জিনিসই বটে, ভাবে ভবশংকর।

"আমি তো তালাচাবি মারলুম, আর গিন্নিকে বললুম, দুধকলা একেবারেই বন্ধ," ভদ্রলোক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন।

"না, শুধু দুধটাই বন্ধ করতে পারতেন, বাঁদরের মুখ থেকে কলা ছিনিয়ে নেওয়া কিন্তু ঘোরতর অপরাধ," সুচিন্তিত মতামত দেয় ভবশংকর।

"ওকালতি কোরো না, একেবারেই ওকালতি কোরো না হে ছোকরা," হঠাৎই গর্জে ওঠেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের খ্যাংড়া গোঁফগুলো যেন বাঘের মতো খাড়া হয়ে ওঠে।

"না, মানে, আমি বলছিলাম, একেবারে না খেয়ে মরবে কিনা," ভবশংকর মিনমিন করে বলে। ভদ্রলোকের 'তুমি' সম্বোধনের বিরুদ্ধেও কিছু বলতে সাহস পায় না সে।

"তোমাদের মতো বাঁদরদের শায়েস্তা করতে আমি জানি, বুঝলে। এই তালাচাবি বাইরে যেমন ছিল, তেমনই



গল্প

পড়ে রইল। জানলার কাচ সরিয়ে ছাদের পাশের কয়েতবেল গাছ বেয়ে পাখি তুমি ফুড়ুৎ।"

"এই যে বললেন বাঁদর, এখন আবার বলছেন পাখি!"

"বাঁদর বলব, পাখি বলব, ইঁদুর, আরশোলা, ছুঁচো, উইপোকা—আমার যা খুশি আমি তাই-ই বলব। ভেবেছ তোমাকে চিনতে পারিনি ছোকরা," চিৎকার করে ওঠেন খ্যাংড়ামুখো ভদ্রলোক।

লোকটার বিশ্রী চিৎকারের মাথামুণ্ডু না বুঝলেও ভদ্রলোকের প্রাণিজগতের প্রতি গভীর ভালবাসা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না ভবশংকর। ভাবা যায়, ভদ্রলোক একটা বাঁদরকে দুধকলা খাওয়ান, পড়াশোনা শেখান! সত্যিই প্রশংসনীয়।

লোকটার চেনা-অচেনা কথার খেই ধরেই ভবশংকর জবাব দেয়, "আমাকে চিনতে পারবেনই তো, আমিই বা আপনার কাছে অচেনা থাকব কেন? কালকেই তো আমাকে দেখেছেন, একেবারেই ঘরোয়া বেশে," পরিবেশটাকে শান্ত করে তোলার জন্য এটুকু তাকে প্রকাশ করতেই হয়।

"ঘরোয়া বেশে!" ভেংচে ওঠেন ভদ্রলোক, "ভেবেছ, তুমিই শুধু বেশ পালটাতে পার, তাই না? ভেবেছ, বেশ পালটালেই বেশ হয়, কেউ আর তোমার বাঁদরামো ধরতে পারবে না?"

"বাঁদরামো-টাঁদরামো এসব কী বলছেন মশাই?" মৃদু আপত্তি করে ভবশংকর, "আসলে দেখুন, ইন্দ্রদার পরামর্শেই আমি একবার ভবা আর-একবার ভবশংকর," নিতান্ত অভিমানে পুরোপুরিই সে বলে ফেলে পরিস্থিতির পরোয়া না করেই।

"ওসব ইন্দ্রটিন্দ্র আমাকে দেখিও না। তুমি ভাল করেই জানো, কীরকম টাকা ঢেলে আমি ফি বছর পুজোআর্চা করি। সব দেবতাই বলতে গেলে আমার হাতের মুঠোয়। ভাল চাও তো মানে-মানে আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে চলো। ধাড়ি ছেলে, লজ্জা করে না বাড়ি থেকে পালাতে! মা যে ওদিকে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল, সে খেয়াল আছে! বাবু এখানে গোয়েন্দা সেজেছেন, পাজি, ছুঁচো কোথাকার।"

দীর্ঘ সংলাপ বলে অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকেন ভদ্রলোক।

"না-না, আপনি একেবারেই ভুল করছেন, আমি আপনার পোষা বাঁদর নই, আমার জন্যই বা আপনার স্ত্রী খামোখা কান্নাকাটি করবেন কেন? আমি স্বর্গীয় ডাক্তার হরিশংকর ব্যানার্জির একমাত্র সন্তান ভবশংকর ব্যানার্জি।"

"সন্তান না শয়তান! বাবার নামটা পর্যন্ত পালটে ফেলা হয়েছে! আবার মা'কে বলা হচ্ছে আপনার স্ত্রী! তোমাকে বাঁদর বলতেও আমার ঘেন্না হয়, তুমি আস্ত একটা জাম্বুবান।"

"দেখুন, আপনার প্রাণিজগতের প্রতি ভালবাসা ভীষণ প্রকট। কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি সত্যি বলছি, আমি ভবা। এই দেখুন, আমার গোঁফদাড়ি সবই নকল," প্রাণপণে নিজের গোঁফদাড়ি খুলতে-খুলতে কবুল করে ভবশংকর।

"এই তো বেরিয়ে পড়ছে, একেবারে বেরিয়ে পড়ছে হুবহু বাঁদরটা। বলে কিনা আমি আপনার বাঁদর নই, আমি ভবা! হাঃ-হাঃ-হাঃ। নরসুন্দরের চোখকে ধোঁকা দেওয়া!"

এরকম বিদঘুটে লোকের নাম নরসুন্দর! একটা গভীর ষড়যন্ত্র কোথাও আছে বলে মনে হয় ভবার। সে কোনওক্রমে টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"জানতাম, তুমি পালিয়ে যেতে চাইবে, সেজন্যই এবার একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছি," বলেই ভদ্রলোক একটা লম্বা দড়ির ফাঁস বের করেন তাঁর ব্যাগ থেকে।

ভদ্রলোককে দড়ির ফাঁস বের করতে দেখেই দরজার দিকে লাফ মারে ভবা। দরজা দিয়ে দৌড়ে উধাও হয়ে যায় চোখের নিমেষে। খ্যাংড়ামুখো ভদ্রলোকও কম যান না। তিনিও উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ধেয়ে যান।

বাইরে রাতের অন্ধকারে দু'টি ছায়ামূর্তিকেই তিরবেগে অদৃশ্য হতে দেখা যায়।

পরপর বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলেও বাড়ি ফিরে এল না ভবা। ভবার মা তো কেঁদে-কেঁদে অস্থির। অগত্যা, একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ভোরের খবর দৈনিকে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপন দিতে হল ইন্দ্রকেই।

পরের রবিবার কাগজ খুলে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল ইন্দ্রর। ভালই লেখা হয়েছে, ফোটোটাও বেশ সুন্দরভাবে ছাপা। বিজ্ঞাপনটায় লেখা হয়েছে, ভবা ওরফে ভবশংকর, পিতা স্বর্গীয় ডা: হরিশংকর ব্যানার্জি, হাটগাছা, করিমপুর। গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে এখনই ফিরে এসো। মা শয্যাশায়ী। গত ১ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ। সন্ধানদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে, ইত্যাদি-ইত্যাদি। বয়ানটা ইন্দ্ররই।

বিজ্ঞাপনটার ঠিক নীচে আর-একটা বিজ্ঞাপনে এসে চোখ আটকে যায় ইন্দ্রর। নীচের বিজ্ঞাপনের ফোটোটাও হুবহু ভবার, দেখে মনে হয় একই লোক অথবা যমজ। নীচে স্পষ্ট লেখা, 'স্নেহের মাধাই, (মাধবচন্দ্র পোদ্দার, পিতা নরসুন্দর পোদ্দার, অ্যাডভোকেট, নয়াবসতি, উত্তর ২৪ পরগনা) বাবা মাধাই, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো। তুমি চলে যাওয়ার পর তোমারই খোঁজে তোমার পিতৃদেবও নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মা মৃত্যুশয্যায়, যেখানেই থাকো ফিরে এসো—দিদিমা।

একই রকম বিবরণ, শনাক্তকরণের চিহ্ন, সন্ধানদানে পুরস্কার ইত্যাদি, ইত্যাদি। দু'টো বিজ্ঞাপনেরই বক্তব্য মোটামুটি এক। ইন্দ্র ভাবে, ফোটোটা হয়তো ভুল করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই একটা চিঠি পায় ইন্দ্র। ভবার চিঠি। মাদাগাস্কার থেকেই লেখা। খুলে পড়ে ইন্দ্র।

*শ্রীচরণেষু ইন্দ্রদা,*

*এ-জীবনে বোধ হয় আর গোয়েন্দাগিরি হল না। রাহুর মতো নরসুন্দর পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোক আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, আমি তাঁর হারিয়ে যাওয়া পোষা বাঁদর, বেঁধে নিয়ে যাবেন আমাকে। ওই হোটেলের দরজায় কড়া নাড়ছেন ভদ্রলোক। আমি হোটেলের জানলায় বিছানার চাদর বেঁধে বাঁদরের মতোই পালিয়ে যাচ্ছি। আগামিকালের ফ্লাইটেই যাচ্ছি কামাটস্কা। উঠছি হিলভিউ হোটেলের ১৩ নং ঘরে, ঠিকানা ১৩ নং এমিলি প্লেস। ওই ঠিকানায় আমার নামে পঁচিশ হাজার টাকা অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও। আর কী।*

*ইতি, তোমার স্নেহের ভবা।*

*ছবি: দেবাশিস দেব*

# কালিকাপুরের

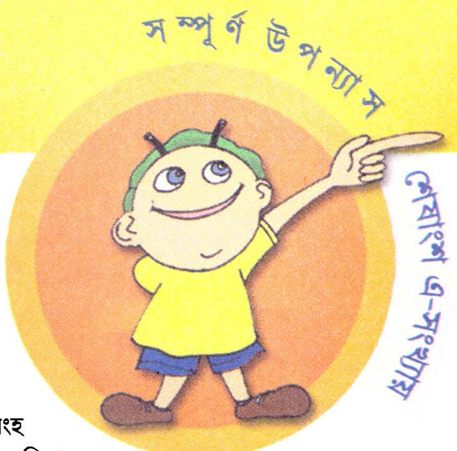


ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

**আগে যা ঘটেছে:** কালিকাপুরে রাজাসাহেব সূর্যকান্তবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল মানুদা, সুমে, নেরু, বাঘা, নন্তু, ভুতো আর পিতু। রাজাসাহেব জমি বিক্রি করতে না চাওয়ায় সন্দীপ শেঠি তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন। ক্যারাটেবিশারদ পিতুর জন্য রাজাসাহেবের মেয়ে রানিকে অপহরণ করতে পারল না গুন্ডারা। মন্দির থেকে বেরিয়ে মা- কালী নাকি নৈশপ্রহরীদের বলেছেন, 'পালা, তোরা সবাই পালা...।' করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির সামনের মাঠে চলছে ম্যাজিক, সার্কাস, ভিডিও শো। তারপর...

# উল্কা

## সৌমেন চট্টোপাধ্যায়




পিতু বলল, "তা ভালই কর‍্যাছেন কাকা। তবে মাঠে ছেল্যা-মেয়্যাদের পেইলে আমিও ক'দিন টেরনিং দিতে পারতাম। আর আপনার কাছ থেকে কিছু শিখতিও পারতাম।"

করঞ্জাক্ষবাবু মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ পিতু, তুমি যে কত বড় স্পোর্টসম্যান, তা আমরা সূর্যকান্তর কাছ থেকে জেনেছি। তুমি তো ভাল ক্যারাটেও জানো। কার কাছ থেকে শিখেছ?"

এবার মানুদা বলল, "বিখ্যাত ক্যারাটেবিদ, ফিফ্‌থ-ডিগ্রি ব্ল্যাকবেল্ট বরেণ সরকার সপ্তাহে দু'দিন করে শেখান রামপুরহাটে। তাঁর কাছেই শিখছে পিতু।"

নেরু না থাকতে পেরে বলে উঠল, "গতবার স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হইছে পিতু। পক্ষপাতিত্ব করছিল জাজ। পিতুরই চ্যাম্পিয়ন হইবার কথা। অপোনেন্টের বাপ বিশাল বড়লোক। টাকা খাইসিল জাজে।"

গজেশ সামন্ত পিতুকে কাছে ডাকলেন। তারপর বললেন, "হাত দু'টো আমার সামনে মেলে ধরো।" পকেট থেকে ছোট্ট একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করে তার হাতের রেখা দেখতে লাগলেন। তারপর উচ্ছ্বাসভরে বললেন, "অসাধারণ পিতু। তোমার মঙ্গল, শুক্র ও বৃহস্পতির স্থান অসাধারণ। একদিন বিরাট সাফল্য পাবে তুমি।"

পিতুর মতো আমরাও তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি হেসে বললেন, "তোমাদের সকলের হাত পরে একদিন দেখব। আর আমি তো তোমাদের কাছেই আছি। এখন থেকে আমি এখন উঠব।"

সঙ্গে-সঙ্গে নগেনবাবু এবং রক্ষিতবাবুও উঠে পড়লেন। নগেনবাবু বললেন, "চলুন, আপনাদের দু'জনকে আমার গাড়িতে করে পৌঁছে দেব।"

রক্ষিতবাবু বললেন, "চলি রে করঞ্জাক্ষ, আবার আসব।" তারপর আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমার বাড়িতেও এসো একবার, অনেক কিছু দেখতে পারবে।" এবার রানির থুতনিতে আদর করে বললেন, "আসি লিট্‌ল হাইনেস। তুমিও যেও। তোমার কাকিমা অনেক দিন তোমাকে দেখেনি। প্রায়ই বলে তোমার কথা।"

আমরাও করঞ্জাক্ষবাবুকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম।

### গজেশ সামন্ত

ফেরার সময় দেখি, অর্জুন সিংহ সেই মেহগনিগাছের নীচে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। 'ঘড়াং-ঘড়াং' করে তার নাক ডাকছে। রানি হঠাৎ একছুটে অবতারের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে খানিকটা খইনির তামাক চাইল। বোকা-বোকা মুখ করে অবতার তার হাতে তামাক দিল কিছুটা। রানি তা দু'হাতে ঘষতে-ঘষতে অর্জুনের কাছে গিয়ে তার সামনে গুড়ি মেরে বসল। তিন জন পুলিশ বাঘ-বকরি খেলছিল, বসার চৌকিতে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে। তারাও কৌতূহল নিয়ে তাকাল রানির দিকে। অর্জুন তখন বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলেছে। পরক্ষণে শ্বাস টানল, আর রানি হাতের চেটো থেকে তামাক গুঁড়ো ঢেলে দিল তার নাকের উপর।

আর যায় কোথায়? অর্জুন "বাপ রে-মাঈ রে, একদম মারডালা' " বলে লাফিয়ে উঠল। ছুটে গেল হাতপাঁচেক। এবার মুখ বিকৃত করে ফোঁসফোঁস আওয়াজ করতে লাগল। তারপর শুরু করল হাঁচতে। "হ্যাঁচ্চো...ফ্যাঁচ্চো...ফ্যাঁচাৎ..." পঁচিশ-তিরিশটা হাঁচি দিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে, চোখ লাল করে সে তাকাল সামনের দিকে। আমরা তখন দুলে-দুলে হাসছি। হাসছে অবতার সিংহ ও তিন কনস্টেবলও।

রাত সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা খেতে বসলাম। খাবার টেবিলে রানি ও কাকাবাবু আমাদের সঙ্গ দিলেন। তিলক রুমালি রুটি, পাতলা মুরগির ঝোল আর মটর-পনির বানিয়েছে। সঙ্গে কাস্টার্ড পুডিং-ও আছে। কাকাবাবু বললেন, "বাবা মানু, যদিও বলেছিলাম তোমাদের বাধা দেব না, কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করছে। খুব সাবধানে থাকবে।"

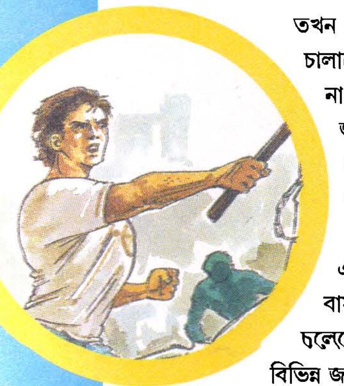
মানুদা একটা মুরগির ঠ্যাংয়ে কামড় দিয়ে বলল, "আমাদের টিমকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না কাকাবাবু! আমরাও চাইছি একটা কিছু ঘটুক। এই রহস্যের একটা কিনারা হওয়া দরকার।"

ভুতো বলল, "আমরা তো একা থাকছি না। পাঁচ রক্ষী— বাসুদেও, কুলদীপ, বৃকোদরদাদু, করুণাকাকা ও শিউপূজনজিও থাকছেন। চিন্তা কিসের? মা-কালী এলেও আমাদের দেখে ফিরে যাবেন। আমাদের খাওয়া অত সস্তা নয়।"

এবার বায়না ধরল রানি, "আমিও ওখানে যাব বাবা। মা-কালী এলে তাকে খুব করে বকে দেব। কেন সে এমন ভয় দেখাচ্ছে।"

অনেক কষ্টে রানিকে নিরস্ত করা হল।

আমরা বাগানবাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। করুণা বড় হলঘরটায় ঢালাও বিছানা করে রেখেছে। আসার সময় বড় ফ্লাস্কে করে কফি আনা হয়েছে। আজ রাতে আমরা ঘুমোব না, ঠিক করে এসেছি। বৃকোদরদাদুর হাতে দেখলাম, রুপোর পাতে মোড়া এক তেল-চকচকে লাঠি।



তখন লোডশেডিং চলছে, তাই জেনারেটর চালানো হয়েছে। হ্যালোজেন বাতিগুলো জ্বলছে না। বেশ কয়েকটা একশো-ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে ইতস্তত। মন্দিরে দু'টো নিয়নলাইট জ্বলছে। তা হলেও এত বড় জায়গা বেশ আলো-আঁধারি।

পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে আমরা সারা এলাকা ঘুরতে লাগলাম। কুলদীপ ও বাসুদেও ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে চলেছে। দিঘির চারপাশ ঘুরে দেখল মানুদা। বিভিন্ন জায়গা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দিঘির ঈশান কোণে নারকেলগাছের সারি। অসংখ্য নারকেল ফলে আছে তাতে। মানুদা টর্চ মারল। দেখলাম, এক-একটা নারকেলের সাইজ আমাদের দেখা সবচেয়ে বড় নারকেলেরও অন্তত দেড় গুণ হবে। এখানকার মাটি কেন এত অস্বাভাবিক রকমের উর্বর?

রাত সাড়ে দশটার সময় হ্যালোজেন বাতিগুলো ক্ষীণ দ্যুতি নিয়ে জ্বলে উঠল। ধীরে-ধীরে তাদের দ্যুতি বাড়তে লাগল। জেনারেটর বন্ধ করল করুণাকাকা। বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে। আমরা চাতালটার উপর বসলাম। বেশ থমথমে পরিবেশ। শুনেছিলাম, রক্ষীরা রাতে তাস খেলে। আজ দেখলাম, তারা বসে আছে এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে।

বৃকোদরদাদু মুখ খুললেন, "কাল রাত্রে মহাকালীর করাল রূপ আমিও দেখেছি। ভয় আমিও পেয়েছিলাম। আমার বয়স অনেক হল। আমি কখনও শুনিনি বা জানি না মহাকালী এভাবে কাউকে দর্শন দিয়েছেন কি না? আমি স্বল্প শিক্ষিত মানুষ, কোনওমতে একটু পড়তে পারি। ভাল লিখতে পারি না। আমার মনে হয়েছে, এই মহাকালীর আবির্ভাব একটা সাজানো ব্যাপার। কোনও চক্রান্ত আছে এর পিছনে।"

তিনি কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "ঈশান কোণ থেকে আলোটা এসেছিল কাল রাতে। তাই আজ দুপুরে করুণাকে নিয়ে বাগানবাড়ির বাইরে গিয়ে ওই ঈশান কোণ বরাবর হাঁটতে থাকি। ওদিককার মাটি পাথুরে, উঁচু-নিচু। কিছু দূরে ক্যানেল আছে। যার ফলে জল পেয়ে অসংখ্য কাঁটাঝোপ, আগাছা, কলমি লতার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে ওখানে। দূরে, গ্রামে ঢোকার রাস্তা, যেটা এই বাগানবাড়ির গেটের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে। ওই জায়গাটা বেশ স্যাঁতসেতে, ক্যানেলের জল চোঁয়ানোর জন্য। আমরা কলমি লতার ঝোপের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দেখলাম, কলমির ডালগুলোকে কে যেন দুমড়ে, চটকে, টেনে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে গেছে। আমার চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। করুণা ভাল করে দেখে বলল, "এই কলমি লতা দোমড়ানোর দাগ এসে এক জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে ছ'টা-ছ'টা করে দু'সারি, মোট বারোটা গভীর গর্তের দাগ আছে। এদিককার দাগ থেকে অপর দিকের দাগের দূরত্ব প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুটের মতো। মনে হয়, কোনও গাড়ির চাকার দাগ। অথচ ওই জায়গাটায় অসংখ্য সাপ আছে। কাঁকড়াবিছেও থাকে অনেক। বাদাবন। দিনের বেলাতেও কেউ ওদিক মাড়ায় না ভয়ে। ওখানে রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে কেউ যেতে পারে এটা ভেবেও আশ্চর্য লাগছে।"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা ছকে নিয়ে বললাম, "মানুদা, তোমার ধারণাই ঠিক। ওই সার্কাস পার্টির দু'-দুটো ওয়াগন ভ্যান আছে। তা ছাড়া বিশ কিলোর দু'টো জেনারেটর আছে। মনে হয়, ওরাই হলোগ্রাফির সাহায্যে গতকাল রাতে মহাকালীকে মর্তে নামিয়েছে।"

নন্তু বলল, "মতিলালের চেহারাটা কাকাবাবুর বর্ণনামতো সন্দীপ শেঠির ড্রাইভারের মতো নয় কি?"

পিতু বলে উঠল, "সব বুঝি গেলছি। চলো মানুদা, এই ঠন সব কথা কাকাবাবুকে বুলি আসি। এক্ষনি চলো।"

ভুতো বলল, "না পিতু, এখন নয়। ভুলে যাস না, আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি হলেও আজকের রাতটা খুব সাংঘাতিক রাত। এই রাত পোহালে যা হয় করা যাবে। আজ আমাদের কেউ এই বাগানবাড়ি ছেড়ে নড়ব না। মনে হয় আজ এখানে কিছু ঘটবে।"

মানুদা একটু ভেবে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, মতিলাল যদি শেঠির ড্রাইভার গোমেজ হয়, তবে করঞ্জাক্ষবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। তা হলে তিনি তাকে তাঁর মাঠে শো করতে দেবেন কেন? করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির দু'টো ঘটনায় খটকা লাগছে। এক নম্বর, যে লোকটা আমাদের দরজা খুলে দিল, তার ডান দিকের ভুরুর উপরে স্টিকিং-প্লাস্টার লাগানো। পিতু বাগানবাড়িতে যে গুন্ডাটাকে মেরেছিল, তারও ওই একই জায়গায় ফেটে গিয়েছিল পিতুর মারে। দু'নম্বর, আমরা যখন করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির ভিতরে ঢুকি, তখন মনে হল, কেউ যেন চকিতে সিঁড়ির পাশে সরে গেল। ভাল করে বুঝতে না পারলেও মনে হল, লোকটার সঙ্গে রমেশ দেওয়ানের সাদৃশ্য আছে।"

বাঘা বলে উঠল, "আমিও দে-দে-দেখেছিলাম। সা-সা-সাদা জামা আর কা-কালো প্যা...।"

মানুদা বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। পরে ভাবলাম, রক্ষিতবাবুর সুপারিশে, সে স্থান পেয়েছিল রাজবাড়িতে। তাই হয়তো রক্ষিতবাবু এসেছেন শুনে সে এসেছে। তাও যদি হয় তবে আমাদের দেখে গা-ঢাকা দেওয়ার কারণ কী? আচ্ছা পিতু, তুই তো দেখলি ভুরু কাটা লোকটাকে। তুই যে গুন্ডাটাকে মেরেছিলি, এটা কি সেই লোক?"

পিতু বলল, "মারের সময় আমি দেখি শুধু পতিদন্দির চোক। চোকের মণি কোন দিকে যেছে, তাই থেকি বুঝি সে বার করবে কুন দিক থেকি। চোক ছাড়া কিছু আমি লক্ষ করিনি। মুখ দেখলি চিনতি পারব না।"

রাত সাড়ে এগারোটা বাজল। দূর থেকে শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুকুরদের ঘেউ-ঘেউ হাহাকার।

হঠাৎ দেখি টর্চের আলো আসছে গেটের ওখান থেকে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে গেটের ওপাশে। লক্ষ্মণ ও রামনাগিনা বন্দুক নিয়ে "কৌন হ্যায়" বলে গেটের দিকে ছুটে গেল। গেটে ভারী তালা বন্ধ। গেটের কাছে যাওয়ার পর তারা টর্চধারীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "ই তিওয়ারি, চাবি লে আ। জ্যোতিষবাবু আইলে বা।"

গেট খোলার পর ঢুকলেন গজেশবাবু, সঙ্গে একটা টর্চ ও সাইকেল। ভিতরে এসে বললেন, "নিজেকে ভীষণ কাওয়ার্ড মনে হচ্ছিল। তোমরা ছোট-ছোট ছেলে, কত সাহস নিয়ে এখানে রাত কাটাচ্ছ। ঘুম আসছিল না, তাই ভাবলাম চলে যাই বাগানবাড়িতে। রমেশের সাইকেলটা নিলাম। সে এগিয়ে দিতে আসছিল। আমি বললাম যে, একাই যেতে পারব।"

মানুদা বলল, "কে বলল আপনি ভিতু! ভিতু হলে এতটা অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে আসা যায় একা-একা? আসুন, একটু কফি খান।"

নন্তু বলল, "আপনি তো জ্যোতিষী। হাত গুনে বলতে পারেন না কী ঘটবে?"

গজেশবাবু কফিতে হাল্কা চুমুক দিয়ে হেসে বললেন, "না, না। সেভাবে কি বলা যায়। তা হলে তো গতকালের মহাকালীর আবির্ভাবের কথাটাও আগাম বলতে পারতাম। আমরা, জ্যোতিষীরা একটা আভাস দিতে পারি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। যেমন বলতে পারি, কারও ফাঁড়া আছে সাতদিনের মধ্যে। সেই ফাঁড়া পথ-দুর্ঘটনা, না ঘরে আগুন লাগা, না জলে ডুবে যাওয়া—বাস্তবে সেটা কী হবে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না।"

বাঘা বলল, "আপনি কি-কি-কিন্তু আমাদের হাত দে-দে-দেখবেন বলেছিলেন।"

গজেশবাবু কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, সকলেই ভিতরের ঘরে চলো। ওখানে জোরাল আলো আছে। রাতে আমার হাত দেখতে অসুবিধে হয়।" এবার বৃকোদরদাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে বৃকোদরদা, তুমি সকলকে নিয়ে এখানে থাকো। আমি এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের হাত দেখে আসছি এখনই।"

বৃকোদরদাদু মৃদ হেসে বললেন, "আমি কবে মরব বলতে পার গজেশ?"

গজেশ বললেন, "তোমার আয়ু বহু দিন। তবে স্বয়ং মহাকালী তোমাকে সংহার করলে বলতে পারব না।"

আমরা ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসলাম সকলে। দু'টো টিউবলাইট ছাড়াও একটা টেবিলল্যাম্প আছে এখানে। সেটাকে বিছানায় এনে জ্বালানো হল। তিনি পকেট থেকে একটা আতশ কাচ বের করে বললেন, "তোমাদের সকলের হাত এক সঙ্গে দেখব।"

পিতু বলল, "আমার হাত তো আপনি আগেই দেখ্যাছেন।"

গজেশ বললেন, "তখন তাড়াহুড়োয় দেখেছি। আজ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখব। তোমাদের হাত দেখার আগে আমি একটা বিশেষ কাজ করব। আমার গুরুর শিক্ষা। তা হল থট-রিডিং। চোখই হল ভবিষ্যতের দুয়ার। এই দুয়ার দিয়েই ঢুকতে হয় আগে। তা হলে ভবিষ্যৎ গণনা অনেক সহজ হয়ে যায়।"

তাঁর হাতের আতশ কাচটা এদিকওদিক নড়ছে। তিনি বললেন, "তোমরা সকলে তাকাও আমার চোখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য। তোমাদের চোখ বেয়ে আমি ঢুকে যাব তোমাদের ভবিষ্যতে।"

আমরা সকলে একসঙ্গে তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছেন একনাগাড়ে। তাঁর হাতের আতশ কাচটা আমাদের চোখের সামনে ক্রমাগত দোলাচ্ছেন। হঠাৎ শিরদাঁড়ায় একটা কনকনে ঠান্ডা অনুভূতি হল। সারা গা, মাথা শিরশির করে উঠল। মনে হল, আমাকে কেউ একরাশ বরফের মধ্যে জোর করে চেপে ধরেছে। কিছুতেই পরিত্রাণ পাচ্ছি না। চোখ ভারী হয়ে উঠল। আর কিছু মনে নেই।

হঠাৎ মুখের উপর ঠান্ডা জলের ঝাপটা পড়তে সম্বিৎ ফিরে এল। চেয়ে দেখলাম, পাশাপাশি আমি, পিতু, নন্তু, নেরু আর বাঘা শুয়ে আছি। বৃকোদরদাদু ও শিউপূজনজি দাঁড়িয়ে আছেন। করুণা ও পাঁচ রক্ষী বালতি করে জল এনে ঝাপটা মারছে আমাদের গায়ে-মুখে। মানুদা, ভুতো ও গজেশ সামন্তকে দেখতে পেলাম না।

আমরা ধাতস্থ হতে বৃকোদরদাদু বললেন, "তোমরা হলঘরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দেখি, গজেশ তোমাদের দাদা আর গোলমুখো ছেলেটাকে নিয়ে বাইরে এল। আমি কিছু বলার আগেই গজেশ বলল যে, একবার রাজবাড়িতে যেতে হচ্ছে তাকে। ওরা দু'জন যাচ্ছে তাকে এগিয়ে দিতে। ফিরতে একটু সময় লাগবে, তবে তারা ফিরে আসবে। আমি কিছুই সন্দেহ করিনি তখন। তোমাদের দাদা যে অত কথা বলে, সে যাওয়ার সময় কিছুই বলল না। দু'জনেই কেমন যেন থপথপ করে চলে গেল। ঠিক যেন কোনও ঘুমন্ত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দু'য়েক পর মনে হল একটা মোটরগাড়ি অন্যদিকে কুরচাগ্রামের দিকে চলে গেল।"

একটু পর করুণা বলল, "কী ব্যাপার, অন্য ছেলেগুলো কী করছে ভিতরে!"

দেখার জন্য সে ভিতরে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল আমাকে। গিয়ে দেখি, তোমরা ছাদের দিকে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছ সবাই। চোখগুলো নির্জীব। শরীর অসাড়।

"আমরা ভয় পেয়ে ডাকলাম তেওয়ারিদের। জোরে-জোরে ঠেলাঠেলি করেও তোমাদের চেতনা ফিরল না। তখন পুরোহিত শিউপূজনকে ডাকা হল। সে কোনার ছোট ঘরে ঘুমোচ্ছিল। সে এসে সব দেখে বুঝল যে, গজেশ একটা শয়তান। তোমাদের সম্মোহিত করে সে ওই দাদা ও গোলমুখো ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। তার কথায় বালতি-বালতি জল ঢালা হল তোমাদের মুখে, গায়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে তোমাদের জ্ঞান ফিরল।"

শিউপূজনজি থমথমে মুখ নিয়ে বললেন, "হাপনাদের সম্মোহন করিয়েসে ওহি শয়তান। আজকা রাত বহুতহি মনহুষ। জানতা নেহি রাজবাড়িমে হালত ক্যায়সা হ্যায়?"

## রানি উধাও

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমরা উঠে পড়লাম। আমার মাথায় কী ভর করল জানি না, বলে উঠলাম, "পিতু, বাঘা, নেরু, নন্তু আজ রাতে রাজবাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটবে। মানুদা ও ভুতো নেই। এই অসহায় অবস্থায় আমরা যারা আছি, তারা শেষ চেষ্টা চালাব। যাওয়া যাক রাজবাড়িতে। কুলদীপজি ও বাসুদেওজি, আসুন আমাদের সঙ্গে।"

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক ফুৎকারে সমস্ত আলো নিভে গেল। আবার লোডশেডিং। করুণাকাকা জেনারেটর চালাতে গেল। নন্তু তেওয়ারির হাত থেকে তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, কুলদীপজি, আপনি গাড়ি স্টার্ট করুন।"

কুলদীপই আমাদের জিপটা চালিয়ে এনেছিলেন। তাঁর কাছেই চাবি ছিল। তিনি গিয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ি স্টার্ট করলেন।

মিনিট আটেক লাগল রাজবাড়ি পৌঁছতে। এর মধ্যেই এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে সেখানে। কাকাবাবু রক্তচক্ষু নিয়ে নিশ্চল অবস্থায় মাটিতে বসে আছেন। রক্ষীদের মধ্যে হরভজন কাঁধে গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তিলক বোধ হয় এই



বিপদের মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে জেনারেটর চালিয়ে দিয়েছে। অর্জুন সিংহ ও আর তিন জন পুলিশ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অবতারের পায়ের গোছ ছিঁড়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে। সেখানে একজন রক্ষী কাপড় বাঁধছে দেখে ছুটে গেল নন্তু। তারপর তার ব্যাগ থেকে ফার্স্ট-এড বক্স বের করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগল।

আমরা কাছে যেতেই কাকাবাবু দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। তিলক কাছেই ছিল। সে আমাদের কিছুটা তফাতে এনে বলল সব বৃত্তান্ত। রানিকে কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। একটা ডোবারম্যান বুকে গুলি খেয়েছে। একটা হাউন্ডের কাঁধে গুলি লেগেছে।

*হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে চারদিক অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে* এক তীব্র আলো এসে পড়ে রাজবাড়ির উপরে। আর আবির্ভাব হয় এক বিশ ফুট লম্বা অতিকায়, উজ্জ্বল দানবের। সেই ভয়ংকর দানবমূর্তি এগিয়ে যায় রাজবাড়ির দিকে। অবতার সিংহ ও পুলিশ তিনজন অকুতোভয়ে সেই দানবের দিকে এগিয়ে যায়। চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুমন্ত এক পুলিশও জেগে ওঠে। সেও বন্দুক দিয়ে ফায়ার করে দানবটাকে। ছক্কা-পাঞ্জা, লালু-ভুলুও ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দানবমূর্তির উপর। অদ্ভুত ব্যাপার, কুকুরগুলো দানবের শরীর ভেদ করে অন্য দিকে ছিটকে পড়ে! যেন সেই দানবের শরীর বায়বীয়!

কুকুর চারটে রানির ঘরের নীচে পাগলের মতো চিৎকার করছিল। অথচ, রক্ষী থেকে পুলিশরা ওই দানবকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এদিকে গিয়েছে অঘটন ঘটে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে মুহুর্মুহু গুলি আসতে থাকে রানির ঘরের নীচের প্রান্ত থেকে। হরভজন ও অবতার আহত হয়। কয়েকটা গ্যাসবোমা ফাটে। সেই অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু বোঝার আগেই চার-পাঁচজন ছায়ামূর্তি রানিকে তুলে নিয়ে পাঁচিলের দিকে দৌড়োয়। কুকুরগুলো সব বুঝেছিল। তারা তাদের দিকে চিৎকার করে ছুটে যায়। ডাকাতরা গুলি ছোড়ে। তাতে দু'টো কুকুরের গায়ে গুলি লেগেছে। পাঁচিলের কাছে গিয়ে তারা যে কী করে অত উঁচু পাঁচিল টপকে পালাল, তা কেউ বুঝতে পারেনি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে সেই দানবমূর্তি দপ করে মিলিয়ে গেল।

পিতু তার পেশিবহুল হাতের সাহায্যে কাকাবাবুকে তুলে তিলকের আনা চেয়ারে বসাল। তারপর বলল, "কাকা, ভাববেন না। আমরা এসি গেলছি। ওই সার্কাসের লোকগুলানই সব কর‍্যাছে। আমরা পুলিশ নিয়ে যেছি।"

পিতু ছুটছে, সঙ্গে আমরা, বাসুদেও ও চারজন পুলিশ। কিন্তু ওই স্টেট-লেবেলের স্প্রিন্টারের সঙ্গে কি পারা যায়? সে আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। পিতু পৌঁছনোর একটু পর আমরা পৌঁছলাম সেখানে, যেখানে মতিলালের সার্কাস, ভিডিও, ম্যাজিক-শো চলছিল। গিয়ে পিতুর সঙ্গে আমরাও হতবাক। দেখলাম তাঁবু, ওয়াগন-ভ্যান, লোহার সরঞ্জাম—সব কিছু কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেছে।

পিতু হতাশ স্বরে বলল, "উঃ হতভাগা ভুতোটা। হুই তখন বুঝলাম যাই সব কথা কাকাকে বুলি আসি। যেতি দিল না। হায়-হায়। এখন মানুদা কুথায়, ভুতো কুথায় আর রানি বহিনই বা কুথায়?" আবছা অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম, পিতুর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে। এক বুক ফাটা দুঃখে আমার দু'চোখের কোণও ভিজে গেছে।

নন্তু এমনিতে কথা কম বলে। আজ দেখলাম, আমাদের চেয়ে তার মন অনেক শক্ত, হয়তো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তার মন দৃঢ় হয়ে গেছে। সে বলে উঠল, "না, এখন চোখের জল ফেলা নয়। চোখের জল ফেলে ভীরুরা। আমাদের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে মানুদা, রানি, ও ভুতোকে। আমরা জানি, কারা তাদের গায়েব করেছে।"

বাঘা বলল, "গ-গ-গজেশ আর ওই তিন জন-এর ম-ম-মধ্যে রয়েছে।"

নেরু বলল, "ঠিক কইছস তুই।"

পিতু রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "এই জায়গায় সময় নষ্ট করে কী লাভ হবে? চল, রাজবাড়িতে চলে যাই।"

আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করতেই একটা নীল মারুতি গাড়ি আমাদের সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। নামলেন করঞ্জাক্ষ, নগেন ও প্রাণগোপালবাবু। নগেনবাবু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, এত রাতে তোমরা এখানে? আমার বাড়িতে একটা পার্টি দিয়েছিলাম। সূর্যকান্তকেও বলেছিলাম। তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমরা তিন জনই ছিলাম সেই পার্টিতে। তা তোমরা কী করছ?"

নন্তু গোমড়া মুখে বলল, "বিরাট ব্যাপার হয়েছে। রানিকে রাজবাড়ি থেকে ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের মানুদা ও ভুতো উধাও।"

তিন জনেই যেন লাফিয়ে উঠলেন তা শুনে। সমস্বরে বললেন, "কী সর্বনাশ, তা হলে তো এখনই রাজবাড়িতে যেতে হচ্ছে।"

ড্রাইভারকে রাজবাড়ির দিকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন নগেনবাবু। আমাদের সামনে দিয়ে মারুতিটা ধোঁয়া ছড়িয়ে চলে গেল।

নেরু টিটকিরি দিয়ে বলল, "ঠাকুরঘরে কেডা, না আমি তো কলা খাই নাই। কে অদের জিগাইছিল যে, এত রাত অবধি অরা কী করত্যাছিল।"

নন্তু বলল, "আমাকে যদি কেউ গঙ্গাজলে গলা অবধি ডুবিয়েও বলে যে, ওরা পার্টি করছিল, আমি বিশ্বাস করব না।"

বাঘা বলল, "এখানে কি-কি কিসসু হবে না। চ-চল ফি-ফি-ফিরে যাই।"

রাজবাড়িতে ফিরে দেখি কুলদীপ দু'জন পুলিশ নিয়ে গাড়িতে করে সিউড়ি চলে গিয়েছে। সঙ্গে দু'টো কুকুর, ছক্কা আর ভুলু। অবতার ও হরভজনকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ছক্কার কাঁধে আর ভুলুর গুলি লেগেছে পাঁজরায়। জানি না, কুকুর দু'টো বাঁচবে কি না? পাঞ্জা ও লালুকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারা ডুকরে কাঁদছে, আর মাঝে-মাঝে আস্ফালন করছে।

কাকাবাবুও নাকি শোকে মুহ্যমান হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এই অঞ্চলের একমাত্র পাশ করা ডাক্তার, মণীশ চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে আনা হয়েছে। আমরা গিয়ে দেখি, পক্বকেশ, সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। সঙ্গে

মনোহর, নগেনবাবু, রক্ষিতবাবু ও করঞ্জাক্ষবাবু। ডাক্তারবাবু নামতে-নামতে বললেন, "না, না, ভয়ের কিছু নেই। নিদারুণ শোকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলাম। ওঁকে শান্তিতে ঘুমোতে দিন। কেউ ডিসটার্ব করবেন না। সকালে ঘুম ভাঙলে আমাকে ডাকবেন, আমি আবার এসে দেখে যাব।"

আয়েঙ্গারজি, যশোদাবাঈ, হলধরদাদু, বলরামদাদু, মাখনদাদু সকলেই শোকে মূহ্যমান। বাকি রাত আর কেউই ঘুমোতে পারলেন না। খবর পেয়ে রামনাগিনা আর লক্ষণ এসেছিল বাগানবাড়ি থেকে। বৃকোদরদাদু, শিউপূজনজি ও করুণাকাকাও নাকি আসতে চাইছেন এখানে। আমরা তাঁদের চলে যেতে বললাম। বললাম, "আপনারা সজাগ হয়ে পাহারা দিন বাগানবাড়িটা। আজকের রাত কাটলে আসবেন।" তাঁরা আমাদের কথা বুঝলেন ও ফেরত চলে গেলেন।

বাকি সব খবরও পেলাম এবার। সুশীলা, রানির ঘরে শুয়ে থাকে রাত্রে। জানলায় দানবের বড়-বড় দাঁত ও ভয়ংকর মুখ দেখে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সময় কেউ স্টিলের মই নিয়ে জানলার কাছে ওঠে ও গ্যাসকাটার দিয়ে গরাদ কাটে। সকলেই ব্যস্ত ছিল দানবকে নিয়ে, এদিকে কেউ খেয়াল করেনি। তা ছাড়া ঠিক সেই মুহূর্তে পরপর কয়েকটা গ্যাসবোমা ফাটায় সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, কেউ রানিকে ইথার দিয়ে অজ্ঞান করে জানলা দিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। স্টিলের মইটা এখনও পড়ে আছে। জানলার শিকগুলো মাঝামাঝি জায়গায় গলানো। গ্যাসকাটার দিয়ে শিক কাটা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সকাল সাড়ে-সাতটা বাজল। কেদার মিশ্র এসে গিয়েছেন। তিনিই জানালেন যে, কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। আমাদের ডাকছেন। আমরা হন্তদন্তভাবে উপরে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। চোখ কোটরাগত। মনোহর একটা ফিডিংকাপ থেকে মাঝে-মাঝে তাঁর মুখে বোধ হয় ফলের রস দিচ্ছে। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন করুণ দৃষ্টিতে, বললেন, "সব শেষ হয়ে গেল। এত লোক বোঝার আগেই সব ঘটে গেল।"

আমি তাঁকে বললাম, "আপনি উত্তেজিত হবেন না কাকাবাবু। এখনই ডাক্তারবাবু আসবেন।"

তিনি ধরা গলায় আবার বললেন, "শুনলাম, মানু ও ভুতোকেও নাকি সম্মোহন করে উধাও করে দিয়েছে গজেশ। কী সাংঘাতিক! অথচ লোকটার এই স্বরূপ আমি কখনওই আঁচ করতে পারিনি। তাকে আমি বিশ্বাসী লোক ভাবতাম। কী শয়তান!"

আমরা সবাই মিলে তাঁকে চুপ করে থাকতে অনুরোধ করলাম। ঠিক এই সময় ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। তিনি ব্লাড-প্রেশার মাপলেন, হার্ট শুনলেন। তারপর বললেন, "আজ আপনাকে অনেকটা ভাল দেখছি। অযথা উত্তেজিত হবেন না। যা ক্ষতি হয়ে গেল, তা তো ভোলা যায় না। দেখবেন, করুণাময়ীর দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে!" এই বলে তিনি কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

ইতিমধ্যে রমেশ মজুমদার এসে গিয়েছেন। তিনি মুখ ভারী করে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারবাবু, উনি এখন কেমন আছেন?"

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় হাত তুলে বললেন, "ভালই আছেন, তবে আপনারা যেন আবার ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবেন না।"

রমেশবাবু জিভ কেটে বললেন, "না, না। আমি তো সব বৃত্তান্ত জেনেই গেছি। ইয়ে, মানে ওঁকে কেন বিরক্ত করতে যাব!"

এবারে ঘরে ঢুকলেন তিন মহারথী। রক্ষিত প্রায় কেঁদে ফেলার ভান করে, কাকাবাবুর বিছানায় বসে তাঁর ডান হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "এ কী হল সূর্যকান্ত? কী সর্বনাশ। রানি এখন কোথায়? আমি ভাবতে পারছি না, এসব কী করে হল?"

করঞ্জাক্ষ ও নগেন সমস্বরে বললেন, "এসব কী হল রমেশবাবু? আপনারা থাকতেও যদি এসব হতে পারে, তবে আপনাদের থাকা আর না-থাকা দুই সমান। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিন আপনারা। আর ঘুমোনগে গজাননদের মতো।"

এবার ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় উঠে দাঁড়িয়ে কড়াভাবে বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে এখন এখান থেকে চলে যান। ওঁকে বিশ্রাম করতে দিন।"

করঞ্জাক্ষ বললেন, "আমাদেরও চলে যেতে বলছেন ডাক্তারবাবু? আমরা অভিন্নহৃদয় বন্ধু।"

তাঁর কথা শেষ না হতেই রাশভারী ডাক্তার ঝেঁকে বললেন, "অভিন্নহৃদয় বন্ধু? তা হলে তো আপনাদের বোঝা উচিত, এই সময় অযথা ওঁর ঘরে বসে পুরনো কথা বলে ওঁকে উত্তেজিত না করাই ভাল। তাতে ওঁর ক্ষতি হতে পারে। দারোগাবাবু, কিছু মনে করবেন না, আপনিও আসুন। আর ছেলেরা, তোমরাও যাও ওঁর ঘর থেকে। ওঁকে আরাম করতে দাও।"

রমেশদারোগা আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বাইরে বেরিয়েই দেখি, গজানন চৌবে একটা চেয়ারে বসে ঢুলছে। রমেশবাবু গলাখাঁকারি দিতেই সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। রমেশবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, "এই চৌবে আর অর্জুনকে নিয়ে মহা সমস্যা। আচ্ছা, তোমরা কী এই রকম আশ্চর্যভাবে কাউকে ঘুমোতে দেখেছ?"

আমরা ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

তিনি চারদিক তাকিয়ে আমাদের বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আমি...মানে গোপনীয়ভাবে একটা আলোচনা করতে চাই। কোথায় বসা যায় বলো তো?"

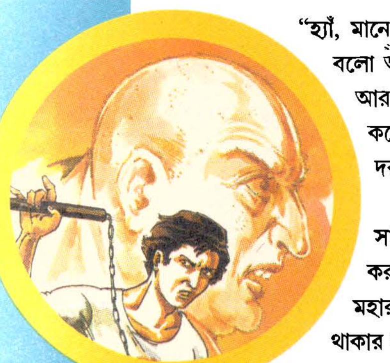
আমি বললাম, "আমরা যে ঘরে থাকছি, সেখানে চলুন। তিলককে চা বলে দেব?"

তিনি হাত নেড়ে বললেন, "না, না, চায়ের দরকার নেই। জরুরি আলোচনা হবে। মানে, আমরা ছাড়া আর কেউ যেন না থাকে।"

নগেন, করঞ্জাক্ষ ও প্রাণগোপালবাবুরা চলে গেলেন। ডাক্তারবাবুও চলে গেলেন। দরকারে তাঁকে ডাকতে বললেন। খবর পেলাম, অবতার ও হরভজন ভালই আছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ছক্কার অবস্থাও এখন ভাল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভুলু মারা গিয়েছে। তার ফুসফুস ভেদ করে গুলি ঢুকেছিল। কথাটা কাকাবাবুকে জানানো হয়নি। ভুলু মারা গেছে জানলে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে পারে।

## গোপন বৈঠক

দরজা-জানলা বন্ধ করে আমরা বসলাম ঘরের মধ্যে। দারোগাবাবু খাটের উপর জুতো-মোজা খুলে একটা বালিশ কোলে নিয়ে জুত করে বসলেন। একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন,



"হ্যাঁ, মানে তোমরা যা-যা দেখেছ বা বুঝেছ, সব বলো আমাকে। ইয়ে, মানে, তোমাদের লিডার আর সেই ছেলেটাকেও শুনলাম অ্যাবডাক্ট করেছে। সব কিছু, মানে, আমার জানা দরকার।"

আমি ওয়াগন-ভ্যান, মতিলাল, গজেশ সামন্তর সম্মোহন থেকে শুরু করে করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির ঘটনা, গত রাতে তিন মহারথীর প্রায় রাত একটা অবধি বাইরে থাকার বৃত্তান্ত—সব বললাম।

বাঘা বলে উঠল, "হ-হলোগ্রাফির কথাটা ব-ব-বললি না তো?"

নেরু, মানুদার সন্দেহের কথা আর হলোগ্রাফিক ইমেজের ব্যাপারে সমস্ত বর্ণনা করল।

দারোগাবাবু আবার একটিপ নস্যি নিলেন, তারপর নাক মুছে বললেন, "কী আশ্চর্য! মানে, তোমাদের বিশ্লেষণ, মানে, অসাধারণ। আমিও বুঝেছিলাম যে, এই মা-কালীর আবির্ভাবের পিছনে আর যাই থাক অলৌকিকত্ব নেই। আর-একটা কথা জানলে তোমরা মানে, চমকে উঠবে। গতকাল রাতে কোনও লোডশেডিং ছিল না। কালপ্রিটরা চেন ছুড়ে শটসার্কিট করে দিয়েছিল। আমার কাছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের লোক এসে জানিয়ে গিয়েছে। আমার একটা প্ল্যান আছে। তাতে মানে, তোমাদের দরকার। আমার স্থির ধারণা, একটা চক্রান্ত বহুদিন ধরে চলছে। ওই তিনজন মানে, রক্ষিত, ভট্টাচার্য আর হালদার—তিনজনই শয়তান। বন্ধুর মুখোশ পরে রাজাবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছে। তবে, আসল নাটের গুরু তারা নয়। ইয়ে, মানে, নাটের গুরু হচ্ছে সন্দীপ শেঠি। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছলে-বলে-কৌশলে বাগানবাড়িটা হাত করা। সোজা রাস্তায়, মানে টাকার লোভ দেখিয়ে যখন কাজ হল না, তখন রানিকে কিডন্যাপের চেষ্টা করল। কিন্তু পিতুর অসাধারণ সাহসের ফলে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন তারা চেষ্টা করে তোমাদের রাজবাড়ির বাইরে আনতে। তা ছাড়া তারা বাগানবাড়িটাকে একটা অভিশপ্ত জায়গার রূপ দিতে চেয়েছিল। তার জন্যই... মানে, মা-কালীর আবির্ভাব। ন্যাকামি করে গজেশ সামন্তই বলেন, 'যে মানে, ওই বাগানবাড়িতে থাকতে তার ভয় হচ্ছে। তখন অন্যরাও ভয় পেয়ে বাগানবাড়ি ছেড়ে রাজবাড়িতে আশ্রয় নেয়। মানে তারা বাগানবাড়িটার দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেছিল, রাজবাড়িতে অ্যাকশন করবে বলে।'

"তোমাদের মানুদা বোধ হয় সব কথা বলেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানে, তোমরা তো জানো, সে দু'বার সিউড়ি গিয়েছিল এখান থেকে। সে গিয়েছিল প্রোফেসর অমর সান্যালের কাছে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জানলাম, তোমাদের মানুদা বাগানবাড়ি থেকে মাটি, জল, পাথর আরও কত কী স্যাম্পল ডঃ সান্যালকে দেয়, পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষায় কী জেনেছেন, তা তিনি মানে, আমাকে বললেন না। বোধ হয় সম্পূর্ণ কাজ তখনও শেষ হয়নি। তার মানে মনে হয়, মানু ও গোলমুখো ছেলেটা কিছু জেনেছিল বাগানবাড়ির রহস্য সম্বন্ধে। তাই তাদের অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে। সহজেই সে কাজ হয়েছে গজেশের সম্মোহনী শক্তির সাহায্যে। তোমাদের মানে, একটা বিশেষ কাজ দিচ্ছি। এই নাও, আমি অনেক ঘুমের ওষুধ এনেছি তোমাদের জন্য।"

আমি বললাম, "ঘুমের ওষুধের কী দরকার?"

তিনি বললেন, "আমি চাই দুপুরে তোমরা টেনে ঘুম দাও ও রাতে জেগে টহলদারি করো সকলের অলক্ষ্যে। তোমাদের দাদা, রানি আর সেই বন্ধু গায়েব হয়ে গিয়েছে। মানে, তোমাদের মনের উপর নিশ্চয়ই চাপ পড়েছে। মানে, ঘুম না-ও আসতে পারে এখন। সকলে তো আর মানে, অর্জুন বা গজানন নয়। তোমরা কুলদীপ ও বাসুদেওর কথা বলেছ। ওদেরও সঙ্গে নেবে। আমি আজ থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ পাহারা কমিয়ে দেব। গজানন, অর্জুন ও আর দু'টো আলসে কনস্টেবলকে রাখব। মানে, তারা যত পারে ঘুমোক। কিন্তু তোমাদের উপর ভার রইল নজরদারি করার। আমি স্পেশ্যাল ফোর্স আনিয়েছি এস-পি সাহেবকে বলে। কেউ জানে না সেকথা। তারা মানে, প্লেন ড্রেসে থাকবে। আমি নিজে রাতে এখানকার ফাঁড়িতে থাকব। যখনই দরকার, যোগাযোগ করবে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যদি আমার ধারণা ঠিক হয়, তবে আজ থেকে দু'-তিনদিনের মধ্যেই সন্দীপ শেঠি আবার আসবে বাগানবাড়ি কেনার জন্য।"

আমরা সারা দুপুর ঘুমোলাম। মনোহর ও যশজিৎ সব সময় কাকাবাবুর কাছে আছে সেবা করার জন্য। দুবেজি ও কেদার মিশ্রও সারাদিন থাকছেন। রমেশ দেওয়ান দুপুরের পরে চলে গিয়েছে। তার মা নাকি খুব অসুস্থ।

রাত ন'টা। চারদিক নিঝুম। আমরা করঞ্জাক্ষ ভট্টাচার্যের বাড়ির একপাশে, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে নজরদারি করছি। ক্রমশ রাত বাড়ল। একটানা ঝিঁঝিপোকা ডেকে যাচ্ছে। বাড়ি রাত দশটার পরেও অন্ধকার। শুধু বাইরে, গেটের কাছে আলো জ্বলছে।

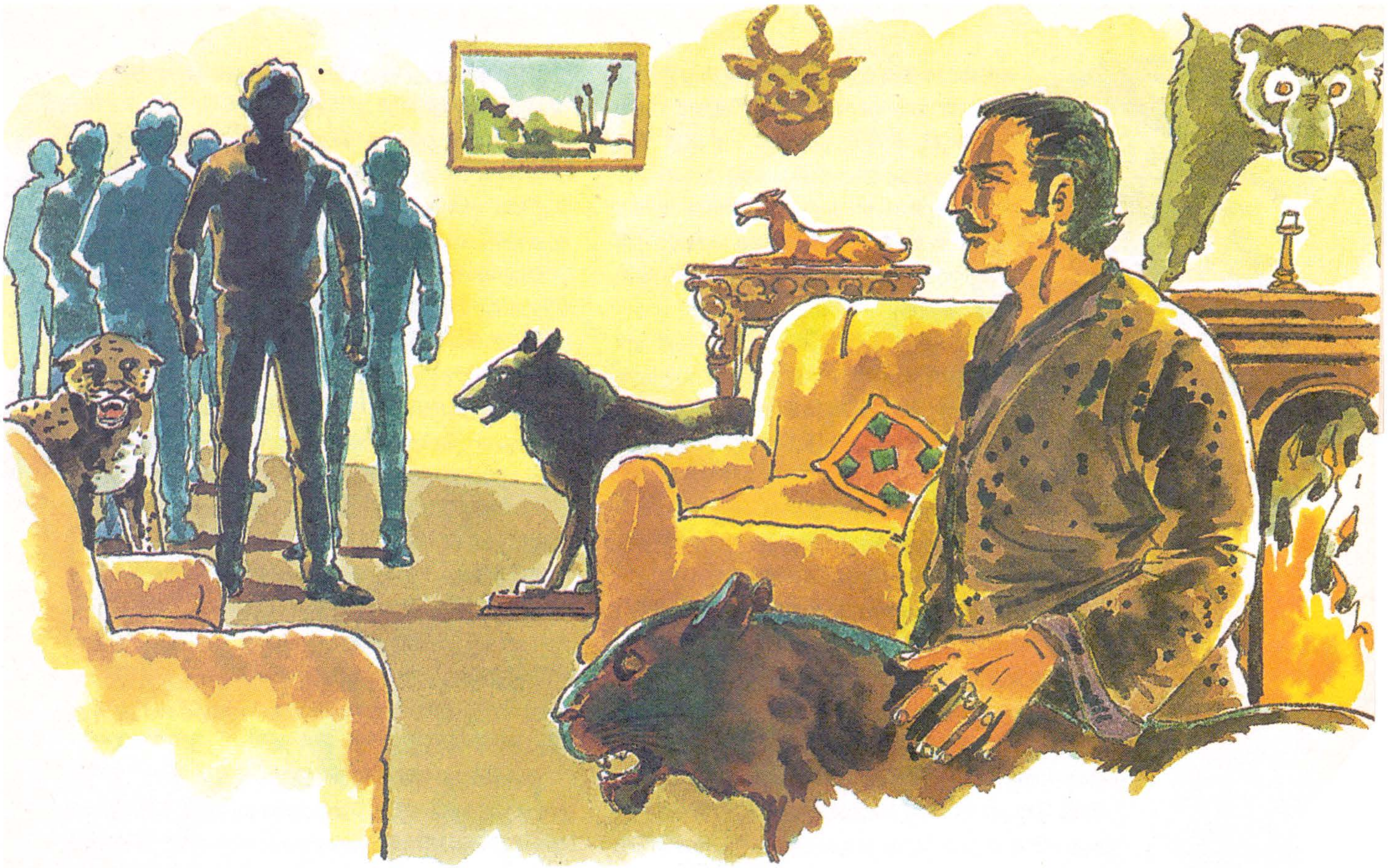
আরও এক ঘণ্টা পর হঠাৎ শুনলাম গাড়ির শব্দ। নীল মারুতি থামল। আর যাকে ড্রাইভারের সিটে দেখলাম, সে আর কেউ নয় রমেশ দেওয়ান। আর একজনও নামল গাড়ি থেকে। তার ডান হাতটা কাঁধ থেকে প্লাস্টার করা আছে, গলায় তিনকোনা স্লিং দিয়ে হাতটা কনুই থেকে ঝোলানো।

আমি চাপা স্বরে বললাম, "এটা পিতুর হাতে মার খাওয়া লোকটা নয়তো?"

গোঁয়ার পিতু বলল, "আমি যাব। সবক'টাকে বেদম মার দিয়ে থানায় লিয়ে যাব।"

নস্তু বলল, "পিতু, পাগলামি করিস না। এখনই দারোগাবাবুকে সব জানাতে হবে। ওঁর নির্দেশ ছাড়া কিছু করা উচিত হবে না।"

রমেশদারোগা একটা ক্যাম্প খাটে শুয়েছিলেন। তাঁকে গিয়ে সব বৃত্তান্ত বললাম আমরা। শুনে তিনি বললেন, "হতে পারে। সব হতে পারে। কিন্তু মানে, এই তিন শয়তান ভীষণ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। মানে, উপরমহলে বেশ হাত আছে এদের। হঠাৎ এখন বাড়িতে পুলিশ চড়াও হলে ওরা ছেড়ে দেবে না। তোমরা মানে, ফলো করে দ্যাখো ওদের। কিছু একটা হদিশ নিশ্চয়ই মিলবে। আমি ইয়ে, মানে, কাল সকালে একাই যাব করঞ্জাক্ষর বাড়িতে। তোমরা এখন মানে, যা দেখেছ তা দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। আমার মনে হয়, রানি ও তোমাদের সঙ্গীদের ওরা মেরে ফেলেনি। কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। মানে, ঠিক কোথায়, সেটাই আমাদের বের করতে হবে। তোমরা চিন্তা করে দ্যাখো, ওদের টার্গেট হচ্ছে বাগানবাড়িটা হাতানো। তার জন্যই এই গায়েব করার দরকারটা হয়ে পড়েছিল। তোমরা মানে, আরও চেষ্টা



চালিয়ে যাও।"

পরদিন রমেশ দারোগা এসে আমাদের বললেন, "হ্যাঁ, মানে, গিয়েছিলাম করঞ্জাক্ষর বাড়ি। কোনও সুবিধেই করে উঠতে পারলাম না। আমাদের মানে, সাবধানে এগোতে হবে। বিশেষ করে ওই তিন জনকে বুঝতে দিলে চলবে না যে, আমরা ওদের সন্দেহ করেছি। ওদের গতিবিধি লক্ষ করছি।"

সারা দুপুর ঘুম হয়নি আমাদের। এখানে খবরের কাগজ বা টেলিভিশনের সাংবাদিকরা আসেন না। মূল সভ্যতা থেকে এ-জায়গা এখনও অনেক পিছিয়ে। তা না হলে এত বড় খবর আজকালকার যুগে চাপা থাকত না।

## অনুসন্ধান

তখন সন্ধে সাতটা। পিতু বাইরের জানলায় চোখ দিয়ে বসেছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "হেই তোরা রেডি হই লে। হুই রমেশ দেওয়ান যেছে। উকে ফলো করতে হবে।"

আমরা বললাম, "কিন্তু এ-সময় বেরনোর ব্যাপারে দারোগাবাবুর কোনও নির্দেশ নেই।"

পিতু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "রেখি দ্যাও তার লির্দেশ? লিজেরা কিছু করতেও পারবে না, কাউকে কিছু করতিও দিবে না। তুরা না গেলি হেই আমি একাই যেছি।"

আমরা জামাকাপড় পরেই ছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। নন্তু পিঠে তার বিখ্যাত ব্যাগটা তুলে নিল।

রমেশ দেওয়ান গেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুটা পরে আমরা বেরোলাম। গজানন কী ভাগ্যিস তখন ঘুমিয়ে ছিল না! আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা জায়েঙ্গা আপলোগ?"

নন্তু বলল, "একটু বাইরে বেড়াতে যাব। ঘরে আর ভাল লাগছে না।"

গজানন সমঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, "ইয়ে স্বাভাবিক হ্যায়। আপলোগোঁকা মনমে ক্যা বিত রহা হ্যায়, বো হাম জানতে হ্যায়। যাইয়ে থোড়া ঘুমকে আইয়ে মনকা পীড়া হাল্কা হো জায়েগা।" লোকটা একটু বেশি ঘুমোয় বটে কিন্তু মনটা ভাল।

রমেশ দেওয়ান সাইকেলেই যায় বেশিরভাগ। জানি না, আজ কী মতলবে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একটা টর্চ আছে। এই ছোট জায়গায় রাস্তায় আলো থাকে না। কিছু দোকানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে টিমটিম করে।

আমরা দেওয়ানের থেকে বেশ পার্থক্য রেখে তাকে অনুসরণ করছিলাম। একবার বোধ হয় তার চোখেই পড়ে যেতাম। পিতু বুদ্ধি করে আমাদের নিয়ে একটা আটচালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রমেশ দেওয়ান বুঝি কিছু আঁচ করেছিল। সে অনেকটা পিছিয়ে এসে চারদিক দেখে নিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার এগোল। সামনেই রামমন্দির। তারপর একটা গলি। সে সেই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পিতু আর সকলকে দাঁড়াতে বলে আমাকে নিয়ে সেই গলির মধ্যে ঢুকল। একটু এগোতেই সারি-সারি টালির ঘর, মহিষের খাটাল, কাটা তামাকের দোকান, চুনের আড়ত দেখতে পেলাম। আমাদের ডান্ দিকে একটা চায়ের দোকান। কয়েকজন বসে চা খাচ্ছে। তার অদূরে এক হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বার। টালির ঘর। সামনে বেঞ্চ পড়ে আছে কয়েকটা। তাতে



গোটাকয়েক রুগি বসে আছে। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় খুব গরিব তারা। তাদের দোহন করেই চলে হাতুড়েবাবুর। দেওয়ান সেই হাতুড়ের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

চাওয়ালা বলল, "পিনসিলিন লাগায়া হ্যায় সুইসে। বহুতহি কড়ক দাওয়াই। পানি তো ডালনাহি পড়েগা। এক সুই পচাশ রুপিয়া।"

একটা পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনের দাম বড়জোর পাঁচ টাকা। সেটা ইঞ্জেকশন করে নিচ্ছে তার দশ গুণ দাম। অশিক্ষার জন্য মানুষ কীভাবে এই হাতুড়েদের কাছ থেকে প্রবঞ্চিত, প্রতারিত হচ্ছে, তা স্বচক্ষে দেখলাম।

আমি পিতুকে বললাম, "রমেশ দেওয়ান বোধ হয় মায়ের জন্যই ওষুধ নিতে ঢুকল। চল ফিরে যাই।"

পিতু গম্ভীর গলায় বলল, "দ্যাখ না কী হোচে?"

আমরা প্রায় মিনিট দশেক থাকলাম চায়ের দোকানে। দেওয়ানকে আর বেরোতে দেখলাম না। পিতুর পরামর্শে আমি মাথা চেপে ধরে ঢুকলাম হাতুড়ের চেম্বারে।

হাতুড়ে এক মাঝবয়সি দেহাতি। আমি ঢুকেই বললাম, "শিরমেঁ বহুত দর্দ ডাগদারসাহেব। কোই দাওয়াই দিজিয়ে।"

হাতুড়েবাবু আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন রাজাসাহেবের অতিথি হিসেবে। রাজাবাবুর তবিয়ত সম্বন্ধে খবর নিলেন। খুব দুঃখও প্রকাশ করলেন যে, তাঁর মতো একজন দিকপাল ডাক্তার এই অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও মণীশের মতো একজন বাজে ডাক্তারকে দিয়ে রাজাবাবুর চিকিৎসা চলছে। আমি যেন রাজাবাবুকে বলি যে, তাঁকে দিয়ে রাজাবাবু একবার যেন জাঁচ করিয়ে নেন।

আমাকে তিনি দু'টো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিলেন। বললেন, "এক গোলি আভি যাকে লে লিজিয়ে। সুবা আউর এক গোলি। সব ঠিক হো যায়েগা। অ্যায়সে তো ইয়ে দো'গোলিকা কিমত দশ রুপিয়া। আপ রাজাজিকা মেহমান হ্যায়, ইসলিয়ে আপ সিরফ পাঁচ-রুপিয়া দিজিয়ে। আপকে লিয়ে কনসিশন।"

চল্লিশ পয়সা দরের দু'টো প্যারাসিটামল পাঁচ টাকায় কিনে আমি তাঁকে বললাম, "বহুত মেহেরবানি আপকি।"

চেম্বারের পরে একটা ভিতরের ছোট ঘর আছে, আমি বেরোতে গিয়ে লক্ষ করলাম। তাই, ঘুরে এসে যা হয় হবে ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাগদারজি, রমেশ দেওয়ান তো ইঁহা আয়া থা, জিনকা মাকো আপ ইলাজ কর রহা হ্যায়। ও ক্যা চলা গয়া?"

হাতুড়ে পানখাওয়া দাঁত বের করে হেসে বললেন, "দাওয়াই রেডি থা। দে দিয়া। ও পিছেকি দরওয়াজেসে নিকল গয়া। উসকা মা বহুতই বিমার থি। আভি হামারা ইলাজ সে ঠিক হো রহি হ্যায়।"

আমি চট করে বেরিয়ে পিতুকে নিয়ে দলের অন্যদের সঙ্গে মিলিত হলাম। পিতু বলল, "লোকটা চক্মা দিং পিছনের দরজা দিয়ে পালিন গ্যাছে। চ, সামনে একটো গলি আছে, ওই দিক দিয়ে যাই।"

আমরা গলিপথে একটু এগোতেই দেখা হল মুন্সি কেদার মিশ্রের সঙ্গে। তিনি খইনির তামাক কিনতে এসেছিলেন।

পিতু তখন মরিয়া। বলে বসল, "রমেশ দেওয়ানকে হোই দিকে দেকলাম। আপনার সনে দেখা হোয়্যাচে?"

তিনি আঙুল তুলে বেশ কিছুটা দূরে এক টালির ছোট্ট বাড়ি দেখিয়ে বললেন যে, "ওটাই নাকি তার বাড়ি।"

মুন্সিজি খুব সাদাসিধে লোক। আমাদের বললেন, "ইয়ে জাগা বহুত গন্দা। আপ ইঁহা ক্যা কর রহে হ্যাঁয়?"

আমি বললাম, "মন খুব খারাপ, তাই এদিকওদিক ঘুরছি। বাড়িতে মন টিকছে না। আমরা আরও ঘুরব। দেরি হতে পারে। আপনি রাজবাড়িতে দয়া করে বলবেন যে, আমাদের ফিরতে দেরি হতে পারে।"

তিনি বললেন জানিয়ে দেবেন। আর বললেন, মনের শান্তির জন্য আমরা যেন বজরংবলির মন্দিরে চলে গিয়ে প্রার্থনা করি। তাতে আমরা মানসিক শান্তি পাব।

নন্তু বলল, "ঠিক আছে মুন্সিজি, আমরা এখান থেকে সেখানেই যাচ্ছি।"

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, "তুই অযথা দেওয়ানের পিছনে ছুটছিস। সে ওষুধ নিয়ে তার বাড়ি গিয়েছে। সেখানে তার অসুস্থ মা আছেন। চল, ফিরে যাই আমরা।"

পিতু একরোখা। সে বলল, "লোকটাকে আমার সুবিধের মনে হোচে না। ইদিকে লোকজনও কম। চল দিকিন, ওর বাড়ির কাছে যেং দেখি কী হয়?"

আমরা শলাপরামর্শ করে পিতুর কথায় রাজি হলাম। দেওয়ানের টালির বাড়ির দিকে এগোলাম। বাড়ির পিছনেই বেশ ঝোপ। সেখানে গা ঢাকা দিলাম আমরা। পাশেই খাটাল। মহিষের বর্জ্য থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ আসছে। নন্তু মশা তাড়ানোর ক্রিম বের করল তার পিঠের ব্যাগ থেকে। তাতে তীব্র লেবুর গন্ধ। তাই দিয়ে দুর্গন্ধ কিছুটা কাউন্টার করা গেল। আমার ঘড়ি ব্যাটারিচালিত। বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখলাম, তখন সময় রাত আটটা বেজে একুশ।

দেখতে-দেখতে রাত ন'টাও পার হয়ে গেল। রমেশ দেওয়ানকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখলাম না। নন্তুর বিখ্যাত ব্যাগ থেকে বেরোল একটা ছোট দূরবিন। সেই দূরবিনে জানলা দিয়ে পালা করে দেখতে লাগলাম আমরা। বেশ বোর লাগছে। খিদেও পেয়ে গিয়েছে প্রচুর। নন্তু তার পিঠের ব্যাগ থেকে বের করল দু'-প্যাকেট বিস্কুট। বাঘার কাঁধে ঝোলানো বোতলব্যাগে জল ছিল। বিস্কুট খেয়ে একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি হল। আমরা এবার পিতুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলাম। বললাম, "এই মশার কামড় খেয়ে আর গোবরের গন্ধ শুঁকে অযথা এখানে বসে লাভ নেই। তুই একা থাকতে চাইলে থাক। আমরা চললাম।"

পিতু চোখ থেকে দূরবিনটা নামিয়ে কোনও কথা না বলে তার পেশিবহুল দেহ নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। দেওয়ানের বাড়ির পিছন দিকের জানলাটা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারল। একটু পরে সে ফিরে এল। বলল, "তুরা যাবি তো যা। আমি যেছি না। তিনজন লোক আছে ভিতরে। একজন চাদর মুড়ি দিন খাটে শুয়ে আছে। রমেশ দেওয়ান একটো লোকের সঙ্গে টেবিল-চেয়ার নিং বসি আছে। একটো কাগজ বের করি কী যেন আলোচনা করছে। মনে হল, ওই লোকটাকে আমরা আগেই দেখেছি। লোকটা মতিলালের সার্কাস পার্টিতে ছিল। যত রাতই হোক, আমি লজর রাখব ওদের দিকে। তুরা যাবি তো যা।"

•

কী আর করা যায়? পিতু যা বলল তাতে সে যে এখান থেকে নড়বে না, তা বলাই বাহুল্য। আমরাও তো আর সত্যি-সত্যি তাকে ফেলে চলে যেতে পারি না! কৃষ্ণপক্ষের রাত। হাল্কা একফালি চাঁদ উঠেছে। চারদিক আলকাতরার মতো অন্ধকার। চারদিক স্তব্ধ। মাঝে-মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে শিয়াল ও কুকুরের ডাক।

রাত প্রায় দশটা। হঠাৎ পিতু আমার গায়ে খোঁচা মারল। দূরবিনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখ। রমেশ বাহির হোচে। সঙ্গে একটো লোক। লোকটাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি।"

দূরবিনে চোখ রেখে দেখি, পিতুর কথাই ঠিক। রমেশ ততক্ষণে জলাজমির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে লোকটাকে নিয়ে।

পিতু এখন লিডার। বলল, "চল, ওদের ফলো করব।"

আমরা সকলে মিলে ঝোপ ছেড়ে সামনে এগোলাম। মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালতে-জ্বালতে দুই মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রায় দু'শো গজ পার্থক্য রেখে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। জলাভূমি পার হওয়ার পর মেঠো রাস্তা। দু'পাশে শাল-বাবলার সারি। দু'জন টর্চ জ্বেলে পিছনে দেখল। আমাদের দেখতে পায়নি। চারদিক দেখে ওরা আবার হাঁটা দিল।

মেঠো রাস্তায় পৌঁছে দেখলাম, ওরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালছে। তাই আমাদের অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা টর্চ জ্বালাতে পারছি না। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় চলতে অসুবিধে হচ্ছে এই নিকষ কালো অন্ধকারে। বাঘা ও নন্তু দু'বার পড়েও গেল।

নেরু ফিসফিস করে বলল, "কই যায় ওরা? গ্রাম ছাড়াইয়া গেসে। এই দিকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও বসতি নাই।"

পিতু হেঁকে বলল, "কথা বলিস না। দেখতে হবে কতি যেছে উয়্যারা?"

গ্রাম ছাড়িয়ে প্রায় চার কিলোমিটার হাঁটতে হল আমাদের, ওই দু'জনের পিছু নিয়ে। ওরা শেষকালে যেখানে এসে পৌঁছল, সেটা একটা ধানমিলের পিছনের দিক। মিলের সামনে কুরচাগ্রাম যাওয়ার রাস্তা। অর্থাৎ, যে রাস্তা দিয়ে আমরা কালিকাপুরে এসেছিলাম। গোটা ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। এটাই এই অঞ্চলের একমাত্র ধানমিল। যার মালিক নগেন হালদার।

মিলটার সামনের দিকে আলো জ্বলছে। চারদিক পাঁচ ফুট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেশ বড় গুদামের মতো ঘর আছে একটা। চারদিকে ধান শুকনোর জন্য বিশাল চাতাল। মিলের সামনে বিশাল গেট। পিছনের দিকে একটা ছোট লোহার গ্রিলের গেট আছে। আবছা আলোয় দেখতে পেলাম সেটা তালাবন্ধ। রমেশ দেওয়ান কাকে ডাকল উচ্চস্বরে। একটু পরে একজন বেরিয়ে এল গুদামঘরটা থেকে। অপার বিস্ময়ে দেখলাম, যে লোকটা গেট খুলতে এল তার কাঁধ থেকে হাতের কাছ অবধি প্লাস্টার করা। ডান হাতটা স্লিং য়ের সাহায্যে ঝুলছে গলা থেকে। পিতুর শক্ত হাত আমার বাঁ হাতের গোড়ায় চাপ দিল।

বাঁ হাতে করে চাবি দিয়ে গেট খুলল লোকটা। ভিতরে ঢুকে রমেশ চাবি নিয়ে গেট আবার বন্ধ করল। তারপর তিনজনে পিছনের দরজা দিয়ে গুদামের ভিতরে চলে গেল। আমরা কিছু বোঝার আগেই দেখি, পিতু পাঁচিল টপকে চাতালে নেমেছে। তারপর গুড়ি মেরে গুদামের পিছনের দরজাটা পার হয়ে আরও ভিতরে চলে গেল। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমাদের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওই গোঁয়ার পিতু কোনও হঠকারিতা করে বসবে না তো? আমি পাঁচিলের আড়ালে খানিকটা এগিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার গলা শুকিয়ে গেল। গুদামটার পিছনে কোনও জানলা নেই। উপরে বড় ভেন্টিলেটার আছে। তার পাশে এগজস্ট ফ্যান ঘুরছে একটা। নীচ থেকে একটা রেনপাইপ উপরে উঠে গেছে। আর, তাই বেয়ে পিতু শিকারি বিড়ালের মতো উপরে উঠে যাচ্ছে।

পিতু উপরে গিয়ে ভেন্টিলেটারে চোখ রাখল। কী দেখছে সেই জানে? অন্তত মিনিট পাঁচেক সে রেনপাইপ ধরে ঝুলে রইল। এর মধ্যে দেখি, গুদামের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন রক্ষিত, হালদার, ভট্টাচার্য ও রমেশ দেওয়ান। অনেকটা দূরত্ব থাকলেও জোরালো আলো থাকার জন্য প্রত্যেককে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কথা বলতে-বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন সামনে। আর ওদিকটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

এখানে যা হচ্ছে তা দেখে আমাদের চক্ষু-চড়কগাছ। পিতুর উপর বিশ্বাস রাখতে পারছিলাম না। এখন বুঝলাম, ওই গোঁয়ার পিতুর কথাই ঠিক। পিতু ফিরে এসে যা বলল, তাতে আমরা বুঝতে পারলাম, ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। সে বলল যে, গুদাম ঘরটায় সারিসারি ধানের বস্তা ডাঁই করা আছে। দু'সারির মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলার মতো রাস্তা আছে। সে যেখান থেকে দেখছিল, তার নীচেই একটা বড় টেবিল আর ছ'টা গার্ডেন চেয়ার পাতা। পাশে দু'টো ক্যাম্পখাট। তিনটে চেয়ারে রমেশ দেওয়ান, ভুরুকাটা লোকটা আর কাঁধভাঙা লোকটা বসেছিল। পিছন দিকে বড় একটা পেডেস্টাল ফ্যান ঘুরছে।

হঠাৎ টিং-টিং-টিং-টিং করে ঘণ্টার শব্দ হল। রমেশ গিয়ে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা বড় এক লক্ষ্মীমূর্তির প্যাঁচাকে একবার এপাশে, একবার ওপাশে ঘোরাল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরঘর শব্দ করে টেবিলটা থেকে ফুট ছয়েক দূরে মেঝেটা সরে গেল। নীচ থেকে পরপর রক্ষিত, ভট্টাচার্য ও নগেন বেরিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গে গাট্টাগোট্টা একজন দেহাতি বেরোল। রক্ষিত, রমেশ দেওয়ানকে বললেন, "আর অসুবিধে নেই রমেশ। কালকেই বস আসছেন। আজকের রাতটা কোনওমতে কাটালেই চলবে। গজেশবাবু ঘুমোচ্ছেন। রাতের খাবার ঠিক চলে আসবে, আমি বলে দিয়েছি। খাবার এলে গজেশবাবুকে উঠিয়ে খাইয়ে দিও।"

নগেন হালদার কাঁধভাঙা লোকটাকে বললেন, "তুমি আবার কেন রাত জাগবে ফার্নান্ডেজ। তুমি অসুস্থ। তুমি নীচে গিয়ে ঘুমোও। তা ছাড়া তুমি এই অঞ্চলের লোক নও। কেউ এসে গেলে অসুবিধে হতে পারে। সাবধানের মার নেই। রমেশ, সাইফুল থাকুক এখানে। মুকুন্দ তুমিও থাকো।"

দেহাতি লোকটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

করঞ্জাক্ষ বললেন, "ছেলে দু'টোর পেট থেকে কোনও কথা বের করা গেল না। আমাদের ওরা দেখতে পায়নি। ওদের সামনেও যাইনি আমরা। তা হলেও চিন্তা হচ্ছে, কতদূর জানে ওরা? মেয়েটাও দারুণ জেদি। কিছুই খায়নি কাল থেকে।"

রক্ষিত বললেন, "গজেশ সম্মোহনের সাহায্যে চেষ্টা করেছিল, ওদের মুখ থেকে কথা বের করতে। তাতে আবার ছেলে দু'টো নেতিয়ে গেল। শেষে শুনলাম, গজেশই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"



নগেন বললেন, "সে যাকগে। আমাদের ব্যাপার ছেলে দু'টো বা রানির জানা সম্ভব নয়। আমাদের ওরা দেখেনি। আর কাল তো বস আসছেনই। এখানে পুলিশ এলেও কিছু করতে পারবে না। এখানে আসার আর দরকার নেই। রমেশ, আমরা কাজ না মেটা অবধি এখানে আসছি না। কাল সকালেই সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। কোনও চিন্তা নেই। গজেশবাবু যা বলবেন, তোমরা তা পালন করবে। কাল আমরা না আসা অবধি তোমরা কেউ বাইরে যাবে না।"

এত কথা বলার পর পিতু বলল, "নন্তু, তোর ব্যাগের মধ্যে আমি একটো চামড়ার কেস রেখ্যাছিলাম। সেটো বাহির কর।"

নন্তু পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে বলল, "কী যে রেখেছিস কে জানে? বেশ ভারী।" এই বলে সে হাত ভরে একটা লম্বা, ইঞ্চি দশ-বারো চেন লাগানো চামড়ার ছোট ব্যাগ বের করে পিতুর হাতে দিল। পিতু চেন টেনে খুলে যেটা বের করল, সেটা একটা নানচাকু। ইঞ্চি আটেকের দু'টো স্টিলের ব্যাটন পরস্পরের সঙ্গে স্টিলের চেন দিয়ে আটকানো। আমরা পিতুর মতলব বুঝে শিউরে উঠলাম।

বাঘা চোখ বড়-বড় করে ভয়ে-ভয়ে বলল, "পি-পি-পিতু, এসব ক-ক-ক-করতে যাসনি। চল, আমরা বরং দা-দা-দারোগাবাবুকে গি-গি-গিয়ে সব বলে আসি।"

পিতু ততক্ষণে গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। পরনের ট্রাউজারটা খুলছে। এখন তার গায়ে জিনসের টাইট শর্টপ্যান্ট ও গেঞ্জি। সে নানচাকুটা কোমরে বাঁধতে-বাঁধতে বলল, "দারোগাকে বুলবি? বুলবে রেড করতে ওয়ারেন্ট লাগবে। কিছু না হবে বটে। কুনো কম্মের লয় পুলিশরা। তিনটো তো লোক আছে। গুদামের ছাদে একটো মোটা ইস্কাইলাইট আছে দেখ্যাছি। উয়ার কাচ ভেঙি লাফাব আমি, তারপর দেখা যাবে। বাঘা, তু নেরুকে লিয়ে চলি যা। দারোগাকে লিয়ে আয়। চুপচাপ আসতে বুলবি ফোর্স লিয়ে। ভাল করে বুলবি, যেন লোক জানাজানি না করে। নন্তু, তু বাইরে চারদিকে লক্ষ রাখ। ওই তিনটে লোককে মেরি, আমি দরজা খুলি দিব, তখন ডাকব তোকে। আর সুমে, তু আমার সঙ্গে উপরে চল।"

এখন যা অবস্থা, পিতুকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়। যা হয় হবে, ভেবে নিয়ে আমি পিতুর সঙ্গে রেনপাইপ বেয়ে উঠতে লাগলাম। পিতু অবলীলাক্রমে পাইপ বেয়ে উঠে গেল। আমি অতি কষ্টে উঠলাম। শেষটা পিতুই আমার হাত ধরে টেনে তুলল। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, রমেশ দেওয়ান ও ভুরুকাটা লোকটা গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। ষণ্ডামার্কা লোকটা রিভলভারে বুলেট ঢোকাতে ব্যস্ত।

শিকারি বিড়ালের মতো পিতু আট-দশ ফিট পিছিয়ে গেল। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় আমি তখন চোখ বুজে ফেলেছি। তাকাতেই দেখি, তীব্র হুই-ই শব্দ করে পিতু স্কাইলাইটের কাচের উপর লাফ দিয়েছে। দু'পায়ের শক্ত স্পোর্টস-শু-র আঘাতে কাচ ভেঙে গেল ঝনঝন করে। আর পিতুর দেহ সবেগে আছড়ে পড়ল টেবিলটার উপর। টেবিলটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। চেয়ার, বোতল, গ্লাস আর সেই তিনজন ছিটকে পড়ল এদিকওদিক। আমার বুকে তখন ভূমিকম্প হচ্ছে।

তৃতীয় লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পড়ে গেলেও তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে যায়নি। পিতুও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে তার নানচাকু হাতে নিল। লোকটা রিভলভার তোলার আগেই তার নানচাকু হিসহিস শব্দে শূন্যে দু'বার পাক খেয়ে মুহূর্তের ভগ্নাংশে লোকটার রিভলভার ধরা কবজির উপর আঘাত করল। খট করে একটা শব্দ হল। লোকটার কবজি বোধ হয় ভেঙে গেল। সে হাত চেপে ধরে কাতরাতে লাগল। পরক্ষণে পিতু নানচাকু দিয়ে আঘাত করল তার মাথায়। দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। লোকটা যন্ত্রণায় কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে স্থির হয়ে গেল।

রমেশ দেওয়ান ও ভুরুকাটা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব কৌশলে পিতুর ডান হাত-বাঁ হাত ঠিক জাগলিং করার মতো নড়ছে। আর শাঁইশাঁই করে সেই রক্ত হিম করা নানচাকুর দুই ব্যাটন শূন্যে পাক খেয়ে কখনও তার ডান হাতে, কখনও বাঁ হাতের মুঠোয় চলে আসছে। দু'জনের মুখই দেখলাম ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে। রমেশ কাঁপছে, সে তার হাত দু'টোকে মাথার উপর তুলে দিল 'হ্যান্ডস আপ'-এর ভঙ্গিতে। অন্য লোকটাও আস্তে-আস্তে বসতে লাগল দু'হাত মাথায় রেখে।

হঠাৎ সেই লোকটা বসে পড়েই কাঁচির মতো পা দু'টোকে চালিয়ে দিল পিতুর পায়ের ফাঁকে। পিতু বেসামাল হয়ে গেল তাতে। সেই সুযোগে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। রমেশ সঙ্গে-সঙ্গে পকেটে হাত ভরে দিয়েছে পিস্তল বের করার জন্য। আমি মরিয়া হয়ে স্কাইলাইটের ভাঙা কাচের গর্তের মধ্য দিয়ে লাফ মারলাম রমেশের শরীর লক্ষ করে। দু'পা দিয়ে লাথি কষালাম রমেশের দেহে। সে ছিটকে পড়ল। দেওয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। তার শরীর স্থির হয়ে গেল। আমিও পড়লাম মেঝেতে। মাথায় ও পিঠে বেশ জোরে লাগল। পিঠে জ্বলুনি। বোধ হয় কাচে কেটে গেছে পিঠের দু'-একটা জায়গা।

পিতু বেসামাল হয়ে গেলেও নানচাকুর একটা ব্যাটন হাতে ধরে রেখেছিল। লোকটা ঝাঁপাতেই সে অন্য দিকে সরে দাঁড়াল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "আমাদের বহিনকে চুরি করবি? বদমাশ কথিকার। তোকে ভীষণ মার দোব।"

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, গোঁয়ার পিতু হাত থেকে নানচাকু ফেলে দিয়েছে। সে অসম লড়াই চাইছে না, তাই হাতের অস্ত্র ফেলে দিল।

ভুরুকাটা লোকটাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। নানচাকু ফেলে দেওয়া দেখে তার মুখের কোণে এক হিংস্র হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। লোকটা ডান হাতে বিশাল একটা ঘুসি চালাল ও পরক্ষণে ডান পা-টা শূন্যে খেলিয়ে ছুড়ে দিল পিতুর গলা লক্ষ করে। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো শরীর হেলিয়ে অবলীলাক্রমে মার দু'টো এড়িয়ে গেল পিতু। এবার পিতু বাতাসে অর্ধবৃত্তাকারে শরীর ঘুরিয়ে লাফিয়ে উঠল। তার ডান হাত লোকটার নাকে ও বাঁ পা তলপেটে আঘাত করল। দরদর করে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল নাক থেকে। নাক আর তলপেট চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল। তখনও দাঁড়িয়ে আছে কোনওমতে। পিতু আর সময় নষ্ট না করে একটা আপারকাট বসাল লোকটার চোয়ালে। লোকটা ধড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে, তারপর স্থির হয়ে গেল। পিতু গুড়ি মেরে বসে নানচাকুটা তুলে কোমরে জড়াল।

রিভলভার ও পিস্তল তুলে নিল। তারপর আমার দিকে এল। আমি তখনও মেঝেতে পড়ে আছি। আমাকে পরম যত্নে তুলে বসিয়ে বলল, "শাব্বাশ সুমে। তু লাফ না মারলে বেশ বেকায়দায় পড়ি যেতাম।"

সে আমার পা ধরে কয়েকবার উপর-নীচ করল। হাত দু'টো ধরেও প্যাসিভ এক্সাসাইজ করাল। তাতে আমার পিঠের ব্যথাটা কমল অনেকটা। সে আমাকে বসিয়ে জামাটা খুলে দিল। বলল, "দু'ট্যা জায়গা কেট্যাছে মাত্র। গভীর কোনও কাটা নাই। কিসসু হবে না। উঠি দাঁড়া।"

আমি উঠে বসলাম।

পিতু গিয়ে লোহার ছিটকিনি খুলে নন্তকে ভিতরে নিয়ে এল। ব্যাগ পিঠে নন্ত ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। ভিতরের দৃশ্য দেখে নন্তর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। নন্ত ভীষণ স্মার্ট ছেলে। ওই সময় তার কী কাজ, তা সে ভাল করেই উপলব্ধি করে নিল। কিছু বলার আগেই ব্যাগ থেকে ফার্স্ট-এড বক্স খুলে আমার পিঠের কাটা জায়গা পভিডিন আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে পটাপট স্টিকিং-প্লাস্টার লাগিয়ে দিল। ব্যথানাশক অ্যানালজেসিক স্প্রে করল আমার কোমরে। ব্যথাটা অনেক কমে গেল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পিতু আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "কী রে, চলতে পারবি তো?"

আমি হাসিমুখে বললাম, "হ্যাঁ হিরো। এখন ব্যথাটা অনেক কমে গেছে।"

পিতু এবার তাকাল ষন্ডা লোকটা ও রমেশ দেওয়ানের দিকে। তার চোখে আগুন দেখতে পেলাম আমি। তাদের কাছে গিয়ে দু'টো হাত টান করে সজোরে দুই ক্যারাটের চপার মারল রমেশের বাঁ কাঁধে আর লোকটার ডান কাঁধে। "আঃ আহহ" বলে আর্তনাদ করে উঠল তারা। তাদের বাঁ ও ডান কাঁধ ঝুলে গেল। বুঝলাম, দু'জনেরই কলারবোন ভেঙে দিয়েছে পিতু। এবার স্টিকিং-প্লাস্টার এনে তিনজনের মুখে চিটিয়ে দিল সে। নন্ত একটা নাইলনের দড়ি বের করে ওদের হাতগুলো পিছনের দিক থেকে বেঁধে দিল। লোকগুলো আর আর্তনাদ করতে পারছে না। ব্যথায় তারা গোঙাতে লাগল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠেছে তাদের মুখগুলো।

পিতু বলল, "নীচে যারা আছে তারা কিছু বুঝেনি, নইলে টিংটিং ঘণ্টা বাজাত। চ, ইবারে ফাইনাল কাজটো সেরি লেই।"

নন্ত ভয়ে-ভয়ে বলল, "একটু দাঁড়া না। বাঘা আর নেরু পুলিশদের আনতে গেছে। তারা যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবে। পুলিশ এলেই আমরা নীচে যাব। ভুলে যাস না, নীচে রানি, মানুদা, ভুতো বন্দি হয়ে আছে। আমরা ঝামেলা করলে ওদেরও প্রাণনাশের চেষ্টা করতে পারে শয়তানগুলো। আর ঠিক কতজন নীচে আছে, আমরা জানি না।"

পিতুর উপর আমার আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছে। পিতুর হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, পেটাই, পেশিবহুল শরীরটার দিকে তাকিয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল, আমরা জয়ী হবই।

আমি নন্তকে বললাম, "ভয় করলে চলবে না নন্ত। মনকে দৃঢ় কর। পুলিশদের কোনও ঠিক নেই। তা ছাড়া, সাদা পোশাকে অত দূর থেকে আসতে বেশ সময় লাগবে। এর মধ্যে যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে আমরা তীরে এসেও ডুবে যাব।"

পিতু আমার হাতে রিভলভারটা দিল। পিস্তলটা দিল নন্তর হাতে। সে কাঁপা-কাঁপা হাতে সেটা ধরল। আমার বাবার রিভলভার আছে। আমি আমার ও নন্তর পিস্তলের সেফ্‌টিক্যাচ তুলে দিলাম। পিতু নানচাকুটা গলায় জড়িয়ে লক্ষ্মীমূর্তিটার দিকে গেল নীচে নামবে বলে। সে প্যাঁচাটাকে ঘোরাবার জন্য যেই না হাত দিয়েছে অমনি দরজায় টকটক, টকটক করে শব্দ হল।

আমরা সভয়ে সরে গেলাম দরজার দু'পাশে। পিতু অকুতোভয়। সে ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজ বের করতে নিষেধ করল। আমাকে ইশারায় বলল দরজা খুলতে। দরজা খুলে দেখি, এক বছর বারোর ছোকরা দু'হাতে দু'টো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা আধখোলা করে উঁকি দিলাম। ছেলেটা বলল, "বাহারসে কিতনা চিল্লায়া। শো পড়ে থে ক্যা আপলোগ?"

চাপা গলায় বললাম, "হ্যাঁ।"

ছেলেটা টিফিন ক্যারিয়ার দু'টো নামিয়ে বলল, "গেট ভি বন্ধ থা। দিওয়ার টপকানা পড়া। বহুত দিক্কত হুয়া। আপ হামকো শো রুপিয়া দিজিয়ে, মালিক নে বোলা।"

আমি ব্যস্তসমস্তভাবে মানিব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট তার হাতে দিলাম। ছেলেটা আবদার করে বলল, "হামকোভি কুছ দিজিয়ে না। ইতনা দূর আয়া, আপকা খানা লেকে।"

আমি একটা পাঁচ টাকার কয়েন দিলাম তার হাতে। ছেলেটা সেলাম জানিয়ে খুশি মনে বলল, "বহুত সুক্রিয়া আপকো। রাম-রাম বাবুজি।"

আমিও বললাম, "রাম-রাম।" ছেলেটা চলে গেল। বুঝলাম, সে খাবার দিতে আসে।

টিফিন ক্যারিয়ার দু'টো খুললাম আমি। বেশ কিছু হাতে করা মোটা গরম রুটি। একটা খাপে আচার, পেঁয়াজ, লঙ্কাকুচি ও টম্যাটোকুচি। বড় দু'টো খাপে বেশ কিছুটা ঘন অড়হড়ের ডাল। অল্প ঘিয়ের গন্ধ বেরোচ্ছে তা থেকে। আর-একটা টিফিন ক্যারিয়ারভর্তি শুধু মুরগির কষা মাংস। অন্তত দশজনের খাবার। রমেশ দেওয়ানদের টেবিলে কোল্ড ড্রিঙ্কের দু'টো বোতলে জল ছিল। নন্ত কুড়িয়ে আনল মেঝে থেকে। আমি পিতুর দিকে তাকালাম। বেশ খিদে পেয়েছিল। পিতু আমার চোখের কথা বুঝে বলল, "ঠিক আছে। আগে খেঁই লেই। তারপর অ্যাকশন হবে।"

আমরা আমাদের নতুন লিডারের সম্মতি পেয়ে খেতে শুরু করলাম গোগ্রাসে। দারুণ সুস্বাদু মাংস। খিদের মুখে আরও ভাল লাগল। খেয়েদেয়ে জল খেয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। প্রস্তুত হলাম অ্যাকশনের জন্য।

হঠাৎ উপর থেকে ফিসফিস আওয়াজ এল, "পিতু, সুমে, নন্ত তরা সব ঠিক আছস তো?"

ভাঙা স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে দু'টো ছায়া-ছায়া মানুষের মূর্তি দেখলাম। একজন নেরু। অন্যজন কে, তা বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, "সব ঠিক আছে, তোরা নেমে আয়। দারোগাবাবু এসেছেন?"

নেরু বলল, "হ, আইসেন।"

দরজা খুলতেই দেখি রমেশদারোগা, পরনে খয়েরি প্যান্ট ও সাদা জামা। তাঁর পাশে একজন অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক। সঙ্গে ছ' জন সুঠাম চেহারার যুবক। প্রত্যেকের পরনে শর্টপ্যান্ট আর গেঞ্জি। বাঘা দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে নেরু ও আর-



একজন যুবক এসে গেল।

রমেশবাবু সেই ভদ্রলোককে বললেন, "স্যার, ওই ছেলেটাই হচ্ছে ব্রুস লি। মানে, কী যেন নামটা? হ্যাঁ, পিতু মাল। স্যার, এই ছেলেটা পুলিশে যোগ দিলে, মানে, আশ্চর্য কিছু করে দেখাতে পারবে।"

সেই লম্বাচওড়া ভদ্রলোক হচ্ছেন এস পি লোকেশ আচার্য। তিনি বললেন, "রমেশবাবু, ওসব কথা শোনার সময় এখন নয়। ভিতরে চলুন।"

তাঁরা ঢুকতেই নন্তু দরজা বন্ধ করে দিল। আমি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনুসন্ধান ও পিতুর অ্যাকশনের বৃত্তান্ত বলে দিলাম। এস পি সাহেবের মুখ দেখে বুঝলাম, তিনি আমাদের সাহসিকতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন।

তাঁর নির্দেশে একজন স্পেশ্যাল ফোর্সের কমান্ডো বেঁধে রাখা তিনজনের জিম্মায় থাকল। নন্তু গিয়ে লক্ষ্মীর প্যাঁচাটাকে ডান দিকে-বাঁ দিকে ঘোরাতেই মেঝে সরে গেল। একফালি সিঁড়ি প্রায় পনেরো ফুট নেমে গেছে নীচে। রিভলভার হাতে এস পি নিজেই নামলেন প্রথমে, তারপর আমরা বাকিরা। নীচে নামার পর দেখি, একটা চওড়া গলিপথ চলে গেছে সামনে। নিঃশব্দে এগোল পিতু আর-একজন কমান্ডো, লোকেশবাবুর নির্দেশে। তারা সামনে গিয়ে ইঙ্গিত করল আমাদের চলে আসার জন্য। গিয়ে দেখি, গলিটা একটা দশ ফুট ব্যাসার্ধের গোল ঘরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কয়েকটা পেডেস্টাল ফ্যান ঘুরছে। কয়েকটা গুন্ডা তাস খেলছে। ক্যাম্প খাট আছে কয়েকটা। তাতে দু'জন শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একজন মতিলাল, অন্যজন সেই কাঁধভাঙা লোকটা। গোল ঘরটার তিন কোণে তিনটে দরজা দেখতে পেলাম। দরজা থাকা মানেই ওদিকে ঘর আছে একটা-একটা করে। দু'টো দরজায় তালা দেওয়া। একটা ভিতর থেকে বন্ধ।

## শেষ অঙ্ক

সূর্যকান্তবাবু বললেন, "কাল রাতে যখন ছেলে পাঁচটা ফিরছিল না, তখন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর মুন্সিজি এসে বললেন যে, তারা নাকি গ্রাম ঘুরতে গিয়েছে। ফিরতে দেরি হবে। শুনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু তারপর যখন সাড়ে দশটার উপর বেজে গেল, তখন ভীষণ চিন্তা হতে লাগল। আমি কুলদীপ ও মনোহরকে হনুমানমন্দিরে গিয়ে খোঁজ করতে বললাম। মুন্সিজি নাকি ওখানেই তাদের যেতে বলেছিলেন। ঠিক তখনই এক কনস্টেবলের হাত দিয়ে আপনার লেখা চিঠি পেলাম যে, রাত্রে তারা আপনার অতিথি হয়ে থেকে যাবে। সকালে আসবে। তাতে আমি চিন্তামুক্ত হলাম। তা, আপনার সঙ্গে ওদের দেখছি না তো?"

রমেশবাবু বললেন, "ওরা আমার কাছেই গিয়েছিল রাত্রে। তদন্তের ব্যাপারে কথা বলতে-বলতে রাত মানে, দশটার উপর হয়ে গেল। ইয়ে, মানে, ওরা রাজবাড়িতে ফিরতেই চাইছিল। আমি আর ফিরতে না দিয়ে রাত্রে রেখে দিলাম ওদের। আর আপনারা চিন্তা করতে পারেন ভেবে, ইয়ে, ওই চিঠিটা পাঠালাম অর্জুনের মারফত। আমাদের পুলিশ ফাঁড়িতেই ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আসার সময় দেখলাম, ওরা আশ্চর্যজনকভাবে ঘুমোচ্ছে। মানে, তাই আর জাগালাম না। দু'টো কনস্টেবলকে বলে দিয়েছি, তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

একটু পরে গজানন এল। স্যালুট ঠুকে বলল, "রাজাবাবুকা ও তিন দোস্ত আয়ে হায়। অন্দর আনে মাঙতা। ক্যা করুঁ?"

রমেশবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মানে, ওরা আজ সকালে ধানমিলে যায়নি। তিনি বললেন, "উনকো মানে অন্দর আনে দো।"

এস পি লোকেশ আচার্য কনস্টবলের পোশাকে কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে চোখে-চোখে কথা হল রমেশবাবুর। লোকেশবাবু চাপা স্বরে বললেন, "ওই তিন শয়তান রাজাসাহেবের কাছে গেলে কিছু হবে না তো রমেশবাবু?"

রমেশবাবু হাসি মুখে বললেন, "ওরা মানে, কখনওই নিজেদের প্রকাশ করবে না। মানে, ওরা ভীষণ চালাক। আসলে ইয়ে, ওরা অপেক্ষা করছে সন্দীপ শেঠি আসার জন্য। আমার মনে হয়, সেই রাঘব বোয়াল কিছুক্ষণের মধ্যেই, মানে, আসছে।"

আরও অনেকক্ষণ কাটল। আবার সেই নীল রোলস রয়েস গাড়ি রাজবাড়ির সামনের গেটে দেখা গেল। পিছনে, দশটা বড়-বড় টাটাসুমো। গজানন ও অন্য পুলিশরা গেটে আটকাল তাদের। গজানন কী যেন কথাবার্তা বলল আগন্তুকদের সঙ্গে। তারপর এসে রমেশবাবুকে জানাল যে, মুম্বই থেকে সন্দীপ শেঠি এসেছেন। তিনি রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। ভিতরে শুধু শেঠির গাড়িই আসবে। অন্যরা বাইরে থাকবে।

রমেশবাবু, লোকেশবাবুর দিকে তাকিয়ে, চোখের সম্মতি নিয়ে বললেন, "ঠিক হ্যায়। মানে, অন্দর আনে দো উনকো।"

শেঠির বিশাল রোলস রয়েস এসে ঢুকল রাজবাড়ির সীমানায়। বাঁ দিকের জানলার জায়গা দু'টো উঠে গেল। শেঠির রুপালি হুইল-চেয়ার গড়িয়ে নামল একটা পাটাতন বেয়ে।

রমেশবাবু গিয়ে ডেকে আনলেন রাজাসাহেবকে। তিনি সন্দীপের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করছিলেন। রমেশবাবু তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, "নেমে গিয়ে অন্তত কিছু কথা বলে আপদকে বিদায় করাই ভাল।"

শেষ অবধি তিনি রাজি হলেন।

তিন মহারথীও বলল যে, তারাও রাজাসাহেবের সঙ্গে থাকবে বন্ধু হিসেবে। এই অবস্থায় তারা কিছুতেই নাকি শেঠির সামনে তাদের প্রাণের বন্ধুকে ছাড়তে রাজি নয়।

কনস্টেবলবেশী লোকেশ আচার্য একটা বড় গদিওয়ালা চেয়ার নিয়ে এসে রাজবাড়ির সামনের লনে রাখলেন। অর্জুন আনল তিনটে গার্ডেন চেয়ার। রমেশবাবু, রাজাসাহেবকে এনে বসালেন সেই বড় চেয়ারটায়। ভট্টাচার্য, রক্ষিত ও হালদার বসলেন গার্ডেন চেয়ারে। রাজাবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল মনোহর ও বাসুদেও।

সন্দীপ চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, "রাজাবাবু, আমি অক্ষম, পঙ্গু। আমার কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্রও নেই। আসার আগে রেখে এসেছি। আপনার শরীরে ও মনে যে কী কষ্ট, তার খবর আমি রেখেছি। যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বলি, আমি একান্তে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। শুধু আপনি আর আমি।"

রক্ষিত কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললেন, "না। যা বলার আমাদের সামনেই বলতে হবে। আমরা ওঁর সুখদুঃখের সঙ্গী।"

•



সন্দীপ বললেন, "আপনি একান্তে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলুন। আপনার ভাল হবে। আর, এই অক্ষম লোকটা এত পুলিশ পাহারার মধ্যে আপনার কী-ই বা ক্ষতি করতে পারে? এদের সরে যেতে বলুন।"

সূর্যকান্তবাবু বললেন, "কিন্তু আপনাকে আমি তো আগেই বলেছিলাম অযথা এখানে আর আসবেন না। আপনি কেন এলেন? আর আমাকে কেনই বা উত্যক্ত করছেন। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।"

সন্দীপ তার নিখুঁতভাবে কামানো মাথায় হাত রেখে বললেন, "এই আমি কথা দিলাম রাজাবাবু। আজকের পর আর কখনওই আপনাকে ডিসটার্ব করব না। আপনি আমার কথায় রাজি হয়ে যান।"

রাজাবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। প্রাণগোপাল, তুই হালদারদা ও করঞ্জাক্ষকে নিয়ে পুলিশের ওখানে চলে যা। মনোহর ও বাসুদেও, তোমরাও সরে যাও। রমেশবাবুকেও বলে দাও, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে ততক্ষণ যেন কেউ না আসে।"

তিন মহারথী যেন বেশ অনিচ্ছাসহকারেই উঠে চলে গেলেন। বাসুদেও ও মনোহর গিয়ে রমেশবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

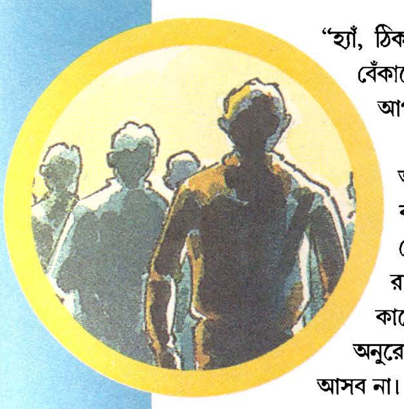
সন্দীপ তাঁর হুইল-চেয়ারটা রিমোটের সাহায্যে ঘুরিয়ে নিয়ে রাজাবাবুর সামনাসামনি হলেন। তারপর বললেন, "আপনার মেয়ে রানি কিডন্যাপ্‌ড হয়েছে আমি জানি। আমিও তাতে খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি পঙ্গু হলেও আমার ক্ষমতা বিরাট। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় আমার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে। এমনকী, সারা বিশ্বেও। আমি চাইলেই আপনার মেয়ে ও ছেলে দু'জনকেই উদ্ধার করে দিতে পারি। মেয়েকে হারিয়ে আপনার যে কী দশা হয়েছে, তা আমি দেখতে বা বুঝতে পারছি। আপনি কেন শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছেন? পুলিশদের তাড়িয়ে দিন। ওরা কিছু করতে পারবে না। আমি আপনার বন্ধু সন্দীপ শেঠি বলছি, আপনার মেয়েকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনব।"

সূর্যকান্তবাবুর ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠল। রাগে বললেন, "তার মানে, শয়তান, তুমিই কিডন্যাপ করিয়েছ রানিকে।"

সন্দীপ হুইল-চেয়ারটা তাঁর আরও একটু কাছে এনে বললেন, "আহা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনার ডাক্তার নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে, এই অবস্থায় আপনার উত্তেজিত হওয়া একদম ভাল নয়। বোকামি করবেন না। আপনার মেয়ে ও ছেলে দু'জনকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। আমি তার ব্যবস্থা করব। এ কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। আর-একটা কথা। আমি আপনার যতই বন্ধু হই না কেন, আমি আসলে একজন বিজনেসম্যান। একজন অনেস্ট বিজনেসম্যান। আপনি আপনার বাগানবাড়ি আমাকে লিখে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার মেয়ে ও ছেলে দু'জন রাজবাড়িতে পৌঁছে যাবে। আপনি আশ্চর্য লোক তো মশাই। ওই সামান্য আড়াই একর জমির দাম আপনার মেয়ের প্রাণের দামের চেয়ে বেশি হল? আমি এক কোটি টাকা দেব আপনাকে, হোয়াইট ক্যাশ। আপনি জায়গাটা আমার নামে করে দিন।"

রাজাসাহেব ফুঁসছেন তখন। বললেন, "তার মানে তুমিই লোক দিয়ে আমার মেয়েকে, ও ছেলে দু'টোকে গায়েব করেছ। শয়তান কোথাকার! এ তোমাদের বহুদিনের চক্রান্ত।"

সন্দীপের মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠল। দম্ভভরে তিনি বললেন,



"হ্যাঁ, ঠিক তাই। সোজা আঙুলে না হলে আঙুল বেঁকাতে হয়। কী করতে পারবেন আপনি বা আপনার পুলিশ?"

সন্দীপ এবার মাথাটা উপরে তুলে, আগুনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "রাজাসাহেব, আমার নাম সন্দীপ শেঠি। আপনার মতো বেশ কয়েকটা রাজাকে আমি কিনে আমার বাড়িতে কাজের লোক বানিয়ে রাখতে পারি। অনেক অনুরোধ করেছি। এবার বলি আমি, আর এখানে আসব না। এই শেষ। হয় আজই বাগানবাড়িটা বিক্রি করুন, নয়তো আপনার মেয়ে এবং ওই ছেলে দু'টোর লাশ আপনি পেয়ে যাবেন। আমি আজ আপনার এখান থেকে খালি হাতে ফিরলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার জন্য দায়ী থাকবেন আপনি নিজে। পুলিশ আমি কেয়ার করি না। সঙ্গে রেজিস্ট্রার সাহেবকেও এনেছি। কাগজ তৈরি আছে। শুধু আপনার সই করা বাকি। টাকা আমি পুলিশের সামনেই দেব। তারাই গিয়ে শহরের ব্যাঙ্কে রেখে আসবে।"

সূর্যকান্তবাবু স্থির হয়ে বসে আছেন কোনওমতে। তাঁর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর মুখটা কালো হয়ে উঠেছে। তাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল। তিনি দু'হাতে মাথা চেপে চেয়ারের হাতল ধরে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। মনোহর লক্ষ রাখছিল। সে একদৌড়ে এসে পিছন থেকে তাঁর কাঁধ চেপে ধরল। তাঁর দু'চোখে জল। তিনি মনোহরকে বললেন, "আমার কিছু হয়নি। মনোহর, তুমি তফাতে যাও।" সে অনিচ্ছা নিয়ে সরে গেল।

রাজাবাবু মাথাটা নত করে ধরা গলায় বললেন, "মিস্টার শেঠি। আমি আপনার কথায় রাজি আছি। কোথায় সই করতে হবে বলুন।"

সন্দীপের শয়তানি হাসি দূর থেকেও শোনা গেল। তিনি বললেন, "এই তো আপনি পথে এলেন রাজাসাহেব। শুধু এত ঝামেলায় পড়লেন। যাই হোক, দারোগাকে ডাকুন। আপনার লোকজনদের ডাকুন, কাজটা হয়ে যাক।"

সকলে আসার পরে শেঠি হাসিমুখে বললেন, "দারোগাসাহেব, রাজাবাবু আমাকে কথা দিয়েছিলেন আজকের ডেটে তিনি তাঁর বাগানবাড়িটা আমাকে সেল করবেন। দামটা একটু বেশি, এক কোটি। তাও আবার হোয়াইট ক্যাশে। সব কিছু গুছিয়ে আমি এলাম। এদিকে আবার তাঁর মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। খুবই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তাঁর শরীরে রাজরক্ত আছে। কথার নড়চড় হওয়ার নয়। কথার দাম আছে তাঁর। তাই এত দুঃখের মধ্যেও তিনি আমাকে জায়গাটা লেখাপড়া করে দিচ্ছেন। ভালই হল। আপনার মতো একজন বিচক্ষণ পুলিশ অফিসারের সামনেই সইসাবুদ হয়ে যাবে। আপনারা সাক্ষী থাকতে পারবেন। হাঃ হাঃ হাঃ।" শেঠির গলায় নির্লজ্জ রসিকতার ঢেউ।

লনের উপরে টেবিল পাতা হল। পেটমোটা, পান-চিবনো রেজিস্ট্রার এলেন। তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। তাঁর একটু টাকার খাঁই আছে। মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন। রেজিস্ট্রারবাবু টাইপ করা স্ট্যাম্প পেপার বের করে জোরে-জোরে পড়ে সকলকে শুনিয়ে বললেন, "তা হলে ঈশ্বরের কৃপায় সবই ঠিকঠাক লেখা হয়েছে। কী বলেন আপনারা? এবার রাজাবাবু, আপনি ঈশ্বরের নাম করে সই করে দিন।"

রক্ষিত, হালদার ও ভট্টাচার্যের মুখ তখন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রেজিস্ট্রারবাবু রাজাসাহেবের হাতে পেন দিয়ে স্ট্যাম্প পেপারের বিশেষ জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন, "এখান থেকে সই করা শুরু করুন। বেশ কয়েকটা সই লাগবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়।" কাঁপা-কাঁপা হাতে কলম তুলে নিলেন সূর্যকান্তবাবু।

সঙ্গে-সঙ্গে রমেশবাবু রিভলভার ছোঁয়ালেন সন্দীপ শেঠির হাঁড়ির মতো মাথায়। পিছন থেকে লোকেশ আচার্য এবং চারজন পুলিশও রিভলভার আর বন্দুক ধরল তিন মহারথীর কপালে। বিস্ময়ে রাজাবাবুর হাত থেকে কলম পড়ে গেল।

সন্দীপ শেঠি রাগে দাঁত কড়মড় করে বললেন, "এটা কী ধরনের রসিকতা হচ্ছে? আপনি ভুলে যাবেন না, আপনি একজন সামান্য পুলিশ ইনস্পেকটর। আমার কপালে রিভলভার ধরেছেন কী অপরাধে? কোন সাহসে? আমি এখানে এসেছি শুধু একটা জায়গা কিনতে। আদালত আছে। আপনার ভবিষ্যৎ আমি শেষ করে দেব।"

এবার এস পি লোকেশ আচার্য এগিয়ে এসে বললেন, "আমি এস পি লোকেশ আচার্য। মিস্টার শেঠি, আপনার খেলা শেষ। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আপনার মতো তিমিমাছকে ধরা অসম্ভব ছিল। আমি যে চেয়ারটায় রাজাবাবুকে বসতে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে মাইক্রোফোন ছিল। আপনার সব কথা রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। আপনার রক্ষীদের নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না। তাদের ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে নিয়েছে আমাদের স্পেশ্যাল ফোর্স। আর রেজিস্ট্রারবাবু, আপনার নামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ বহু দিন থেকে পাচ্ছিলাম। আজ হাতেনাতে ধরা পড়লেন। আপনার অ্যাটাচিতে কড়কড়ে আশি হাজার টাকার বান্ডিল পাওয়া গেছে।"

রেজিস্ট্রারবাবু হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, "আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমার সংসার ভেসে যাবে।"

এস পি তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "বংশীধর, একে নিয়ে যাও।"

এবারে সন্দীপ শেঠির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ভেবেছিলে টাকার জোর ও লোকবল নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। তুমি পুলিশকে মানুষ বলে মনে করোনি। এত বড় একটা অপরাধ তুমি পুলিশের নাকের ডগায় করতে চেয়েছিলে। ওই সাতটি ছেলে অসাধারণ। ওদের লিডার বাগানবাড়ির রহস্য অনেকটা বুঝে ফেলেছিল বলে ওকে ও আর-একটি ছেলে, যে ছিল ওদের দলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তাকে সরিয়েছিলে। ওদের মধ্যে পিতু ছিল অসাধারণ। ওর সাহসিকতায় আর অন্য চার জনের সাহায্যে গতকাল রাতে গোপন জায়গা থেকে আমরা রানি ও ছেলে দু'টোকে রেসকিউ করেছি। পিতু ও অন্যরা না থাকলে হয়তো তোমার এই শয়তানি চাল কার্যকর হত। সরকারের তরফ থেকে আমি পিতু ও এদের দলের সকলকে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করব।"

সন্দীপ শেঠির হাতে হাতকড়া লাগানো হল। লোকেশবাবু এবার বিস্মিত সূর্যকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারছেন না রাজাসাহেব। গত কাল রাতেই রানি ও ছেলে দু'টোকে উদ্ধার করা হয়েছে। পিতু ও অন্য চারটি ছেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের বাঁচিয়েছে। আপনাকে

জানাইনি। কারণ, তাতে আমাদের প্ল্যান ভেস্তে যেত। আর, রানিদের উদ্ধার করে গত রাতে যদি আমরা রাজবাড়িতে নিয়ে আসতাম, তা হলে সন্দীপ শেঠির তিন চর, অর্থাৎ আপনার তিন প্রাণের বন্ধু টের পেয়ে যেত। আপনার দেহে রাজরক্ত আছে। সব জেনে আপনি অভিনয় করতে পারতেন না। ক্ষমা করবেন, আপনাকে অনেক কষ্ট দিতে হল বলে। ভেবে দেখুন, আপনি সব কিছু না জানার জন্য সন্দীপ শেঠির সঙ্গে আপনার যে কথোপকথন হল, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। আপনাদের কথা আমি রেকর্ড করে রেখেছি। কোর্টে প্রমাণ দিতে কোনও অসুবিধে হবে না। সন্দীপ ও তার দলকে ধরব বলেই সব কিছু গোপন রাখতে হয়েছে।"

এর মধ্যে একটা বড় পুলিশভ্যান এসে ঢোকে রাজবাড়ির গেট ছাড়িয়ে। রমেশবাবু বললেন, "রাজাসাহেব, ওই দেখুন ইয়ে, মানে, আপনার মেয়ে রানি ও ছেলে-সাতটা এসে গেল।"

আনন্দে সূর্যকান্তবাবুর দু'চোখে জল পড়ছে তখন।

পরদিন সন্ধেবেলা রাজবাড়িতে সকলে মিলিত হলাম। কাকাবাবু সেই আনন্দঘন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকলকে। লোকেশ আচার্য থেকে আরম্ভ করে ডা: চট্টোপাধ্যায়, প্রোফেসর সান্যাল বা কনস্টেবলরা আর স্পেশ্যাল ফোর্সের কমান্ডোরা সবাই আমন্ত্রিত ছিলেন।

মানুদাকে সকলে মিলে অনুরোধ করা হল মূল রহস্য কী ছিল তা জানানোর জন্য। মানুদা শুরু করল, "আমার মাথায় একটা বিরাট প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিল, ওই আড়াই-তিন একর জায়গা এত উর্বর কেন? আমি সেখানকার মাটির কিছু স্যাম্পেল নিয়ে প্রোফেসর সান্যালের কাছে যাই। বরদাকান্তবাবু সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কোনও উল্কাপিণ্ড সেখানে পড়েছিল বহু যুগ আগে। তাঁর ধারণা কাছাকাছি গেলেও ঠিক ছিল না। আপনারা জানেন, আগ্নেয়গিরি কী? তা হচ্ছে একটা গভীর গর্ত, যা দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা ম্যাগমা অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপে গলে যাওয়া ধাতু, বিভিন্ন পাথর, সিলিকা, সালফার, আয়রন, কার্বন ভূপৃষ্ঠে চলে আসে। যাকে আমরা বলি লাভা। আমাদের ভূপৃষ্ঠ অনেকটা দুধের সরের মতো। উপরটা কঠিন, যেখানে আমরা বাস করছি বা জীবনধারণ করছি। ভিতরে প্রচণ্ড তাপ। ৩,৫০০ সেলসিয়াসের বেশি। আপনারা জানেন, এই তাপমাত্রায় কার্বন অবধি গলে যায়। ভিতরে সব কিছু টগবগ করে ফুটছে। বাইরে বেরনোর রাস্তা পেলে এই ম্যাগমা প্রচণ্ড চাপে সব কিছু ফাটিয়ে দিয়ে লাভার আকারে বেরিয়ে আসে। যাকে ভলক্যানিক ইরাপশন বা আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত বলা হয়। আমাদের এই কালীমন্দিরের চারপাশের জায়গা একটি ভলক্যানিক বেস ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতির খেয়ালে এই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছিল খুব ছোট। কতদিন আগে এর থেকে শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে তা বলা শক্ত। স্যার বলেছেন, সমস্ত স্যাম্পেলের ইলেক্টোফোরেটিক অ্যানালিসিস ও রেডিও-কার্বন অ্যাসেসমেন্ট করলে তা আন্দাজ করা যাবে। বহুদিন ধরে এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরি। সব আগ্নেয়গিরির ক্ষেত্রে না ঘটলেও কিছু আগ্নেয়গিরি আছে, যার লাভায় কার্বনের পরিমাণ খুবই বেশি। বড় আগ্নেয়গিরির চেয়ে ছোট ভলক্যানো, যা হয়তো কয়েক লক্ষ বছর আগে শেষবারের মতো অগ্ন্যুৎপাত করেছে, সেখানে এক বিশেষ ব্যাপার লক্ষ করা যায়। অগ্ন্যুৎপাতের পর লাভা ভলক্যানিক বেসের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবার যখন ইরাপশন হয় তখন আগের লেয়ারের উপরে নতুন লেয়ার চেপে যায়। যেহেতু জ্বালামুখের সাইজ ছোট, তাই ভিসুভিয়াসের মতো লাভা বহু দূর ছড়িয়ে পড়ে না। শেষ অবধি বহুদিন ধরে লেয়ারে-লেয়ারে লাভা জমা হওয়ার পর জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে ভলক্যানো ডেড বা মৃত হয়ে যায়। সাউথ আফ্রিকায় এরকম বহু আগ্নেয়গিরি ছিল যা এখন হিরের খনিতে পরিণত হয়েছে। রক্ষিতবাবু, যিনি ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্ণধার, তাঁর জহুরি চোখে গোটা ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। তিনি বুঝে যান যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা হিরে...।"

নন্তু চিৎকার করে উঠল, "কী বলছ মানুদা, হিরে?"

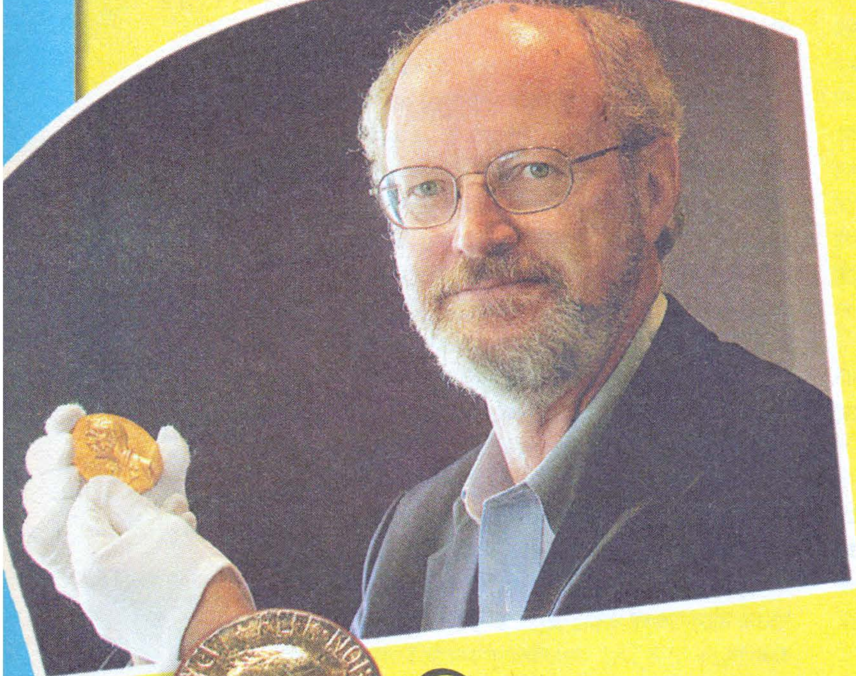
আমরা হতবাক। এস পি লোকেশ আচার্য ও দারোগা রমেশ মজুমদারের চোখও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

প্রোফেসর সান্যাল মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ হিরে বা ডায়মন্ড। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হিরে হচ্ছে ক্রিস্টালাইন, ট্রান্সপারেন্ট হিরে যা পাওয়া যায় ভলক্যানিক পাইপে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘন বস্তু, যার ঘনত্ব এক কিউবিক সেন্টিমিটারে সাড়ে তিন গ্রাম। যাকে কিম্বারলাইটও বলা হয় পরিভাষায়। বলে যাও মানস।"

মানুদা শুরু করল, "জায়গাটা খুঁড়লে, বেশ কিছুটা দূর গেলেই পাওয়া যাবে উৎকৃষ্ট মানের হিরে। রক্ষিত তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু কাকাবাবুকে ফাঁকি দিয়ে করঞ্জাক্ষবাবুকে দলে টানেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন নগেন হালদার। এঁদের মাথা বেশ ঠান্ডা। অনেক দিন ধরেই তাঁরা প্ল্যান কষেছিলেন জায়গাটা হাত করবেন বলে। মনে হয়, গজেশকে দিয়েও চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কী এক ঐশ্বরিক বলে তাঁকে সম্মোহিত করতে পারেনি গজেশ। তা ছাড়া এঁরা চাননি, ধরা পড়ুক। ভীষণ চালাক এঁরা। তাই এঁরা সন্দীপ শেঠিকে সব জানান। করঞ্জাক্ষবাবু বহু জায়গা-ঘোরা লোক। বোধ হয় তিনিই রক্ষিতকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, সকলের অজান্তে এলাচ-কাজু গাছের বাগিচার আড়ালে এখান থেকে হিরে তুলবেন। আর এ-জায়গা একেবারেই পিছিয়ে পড়া। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। এখানে নজরদারি করার মতো কোনও সরকারি সংস্থাও নেই। যে সন্দীপ শেঠি এখানে হলোগ্রাফি করে মা-কালীকে মর্তে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে হিরে তুলে বিদেশের বাজারে পাচার করা ছেলেখেলার মতো। এই জায়গায় বিপুল পরিমাণ হিরে না থাকলেও যে পরিমাণ আছে তা আমাদের এই গরিব দেশের আর্থসামাজিক স্তরে বিপ্লব এনে দিতে পারে, তা সন্দীপ জানতেন। তাই তিনি জায়গাটা লিজ় নেওয়ার প্রস্তাব দেন। বছর আট-দশেকের মধ্যেই জায়গাটা খোকলা করে দিয়ে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে হয়তো বিদেশে পাকাপাকিভাবে চলে যেতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চ্যালারাও হয়ে যেত অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থের মালিক। বাকি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতেই পারছেন।"

সূর্যকান্তবাবু রানিকে কোলে নিয়ে বললেন, "ডক্টর সান্যাল, আপনারা গভর্নমেন্টকে সব জানান। এই হিরের খনি তো এখন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়ে যাবে। আমাদের এই পিছিয়ে থাকা জায়গা কত উন্নতি লাভ করবে। লোকেশবাবু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কালীমন্দিরটি যেন নষ্ট না করা হয়। সরকারের কাছে আমার সঙ্গে আপনারাও এই প্রার্থনা রাখবেন।"

(সমাপ্ত)



## চিকিৎসাশাস্ত্র

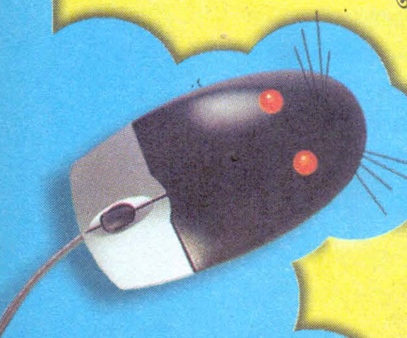
এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, উদ্বেগ আর অনিয়মিত জীবনযাপনই পেপটিক আলসার আর গ্যাসট্রাইটিস-এর কারণ। এই ধারণা নস্যাৎ করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী রবিন ওয়ারেন ও ব্যাবি মার্শাল। তাঁরা প্রায় ১০০ রোগীর পাকস্থলী নিয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখলেন, পেপটিক আলসারের জন্য দায়ী সর্পিলাকার এক জীবাণু, নাম, হেলিকোব্যাক্টর পাইলেরি। এই জীবাণুটির জন্যই মানুষ আক্রান্ত হয় এ দুটি রোগে। এই জীবাণুটি আবিষ্কারের জন্যই চিকিৎসাশাস্ত্রে এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন এই দুই বিজ্ঞানী। এই আবিষ্কারের ফলে জানা গেল অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধের সঠিক প্রয়োগই এ দু'টি রোগ সারাবার মোক্ষম দাওয়াই।



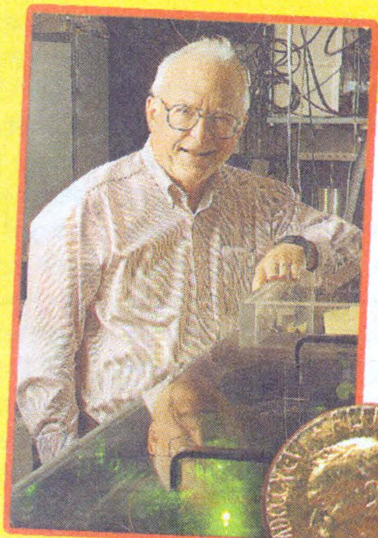
# বিজ্ঞানে এবারের নোবেল

## রসায়ন

রসায়নে নোবেল প্রাইজ পেলেন এক ফরাসি ও দুই মার্কিন বিজ্ঞানী— ফ্রান্সের ইভ শঁভ্যা ও এবং আমেরিকার রিচার্ড শ্রক ও রবার্ট গ্রাবস (উপরের ছবি)। তাঁদের আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে—ধরা যাক, ক আর খ হাত ধরাধরি করে নাচছে। একইসঙ্গে নাচছে গ আর ঘ। হঠাৎ হাতবদল। নতুন জুটি তৈরি হল ক আর ঘ ও খ আর গ। ঠিক এরকমভাবেই কিছু-কিছু জৈবরাসায়নিকের অণুগুলো পরস্পরের হাতবদল করে নতুন-নতুন জোট বা রাসায়নিকে রূপান্তরিত হয়। এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে মেটাথেসিস বিক্রিয়া, যাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত তৈরি হয়ে চলেছে জীবনদায়ী ওষুধ, কীটনাশক ইত্যাদি। এই গবেষণা ওষুধ শিল্প, জৈবপ্রযুক্তি ও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে আসবে। পলিমার ও অত্যাধুনিক প্লাস্টিক তৈরিতেও এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর হবে। প্রায় ৫০ বছর আগের মেটাথেসিস বিক্রিয়ার আবিষ্কারই এবার নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দিল তিন বিজ্ঞানীকে।



**বেদদ্যুতি চক্রবর্তী**



## পদার্থবিদ্যা

মার্কিন বিজ্ঞানী জন হল (বাঁ দিকের ছবি) ও জার্মানির থিওডোর হান্স লেসার রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে এমন এক অভিনব উপায় (স্পেকট্রোস্কোপি) আবিষ্কার করেছেন, যা দিয়ে সময়কে মাপা যাবে একেবারে নিঁখুতভাবে। মিটারের দৈর্ঘ্যে গরমিল হওয়ার আশঙ্কা আর নেই বললেই চলে। নিঁখুত মাপজোখের এই অনন্য পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ওঁরা পেলেন নোবেল পুরস্কার। পদার্থবিদ্যায় তৃতীয় নোবেলজয়ী রয় গ্লবার। তিনি পুরস্কার পেলেন আলোককণার গতিবিধি আবিষ্কার করে। অবাক হতে হয়, এই কাজটা তিনি করেছিলেন প্রায় ৩২ বছর আগে।



# মই নিয়ে হইচই

গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

(শেষাংশ এই সংখ্যায়)





মই নিয়ে হই চই
খুনি হ্যায়, ডাকু হ্যায়, চোট্টা হ্যায়। উসকো হাতকড়া লাগানা ঠিক হ্যায়!
সব্বোনাশ! বলে কী!
পরের স্টপ এসে পড়ল।
নামুন, এলগিন রোড, নামুন!
যাক, বাসটা খালি হয়ে গিয়েছে। এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত।
আরে ব্বাস! চমৎকার একটা মই রয়েছে রে এখানে! দ্যাখ, দ্যাখ!
দেখিস, যেন পায়ে আটকে পড়ে না যাস!
আহা, মই বেয়ে যেন উঠিনি কখনও! আমাদের ছাতেই তো রয়েছে মই!
মরেছে!
তুই সিটে গিয়ে বোস। আহা, এমন একটা চমৎকার মই! বিনে পয়সায় চড়ে নিই মজা করে!
কালীঘাট আসছে।
দেখেছিস, কী মজা...জা...আ...আ...আ...!
আঃ আঃ আঃ আঃ আঃ

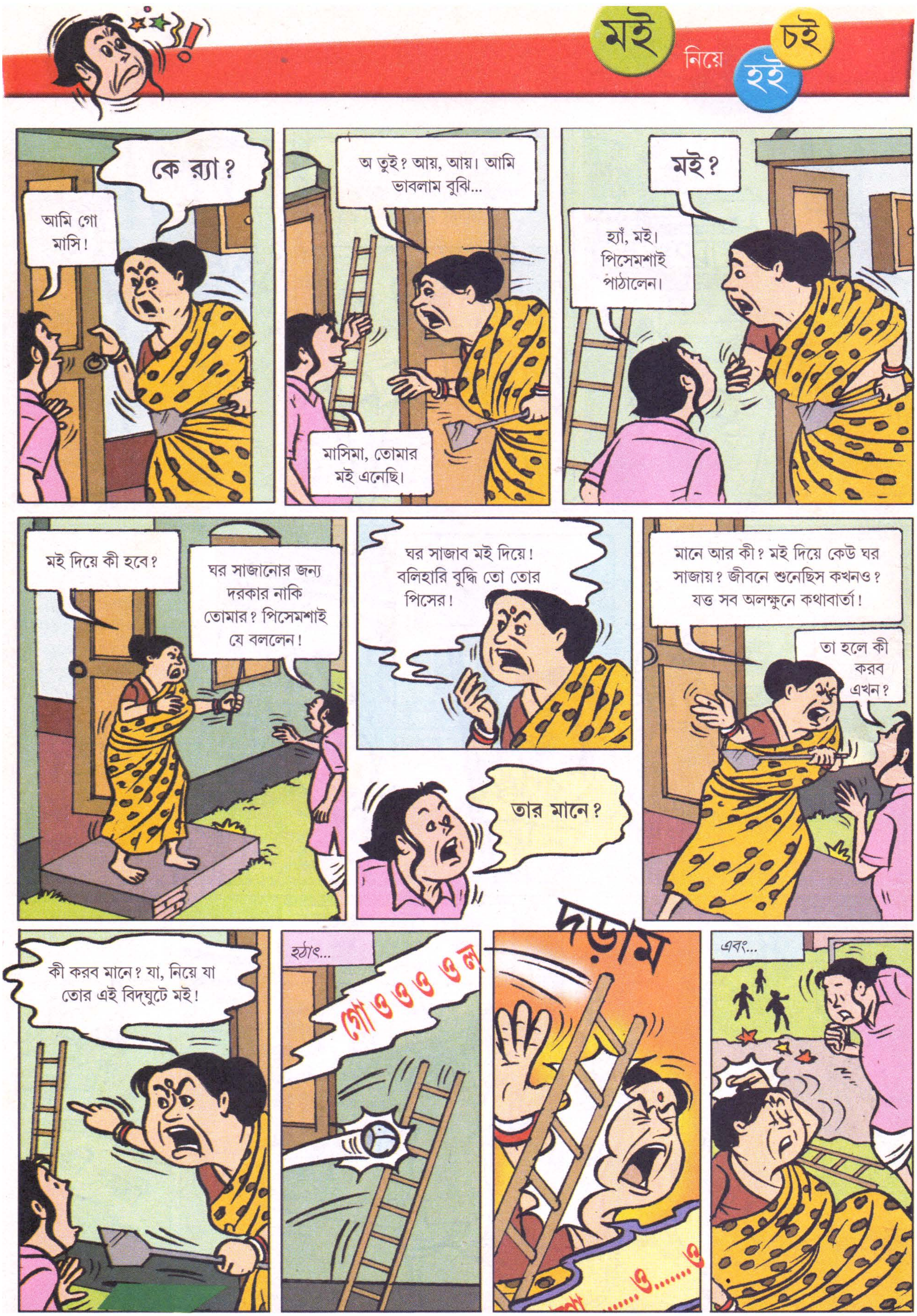
# মই নিয়ে হই চই



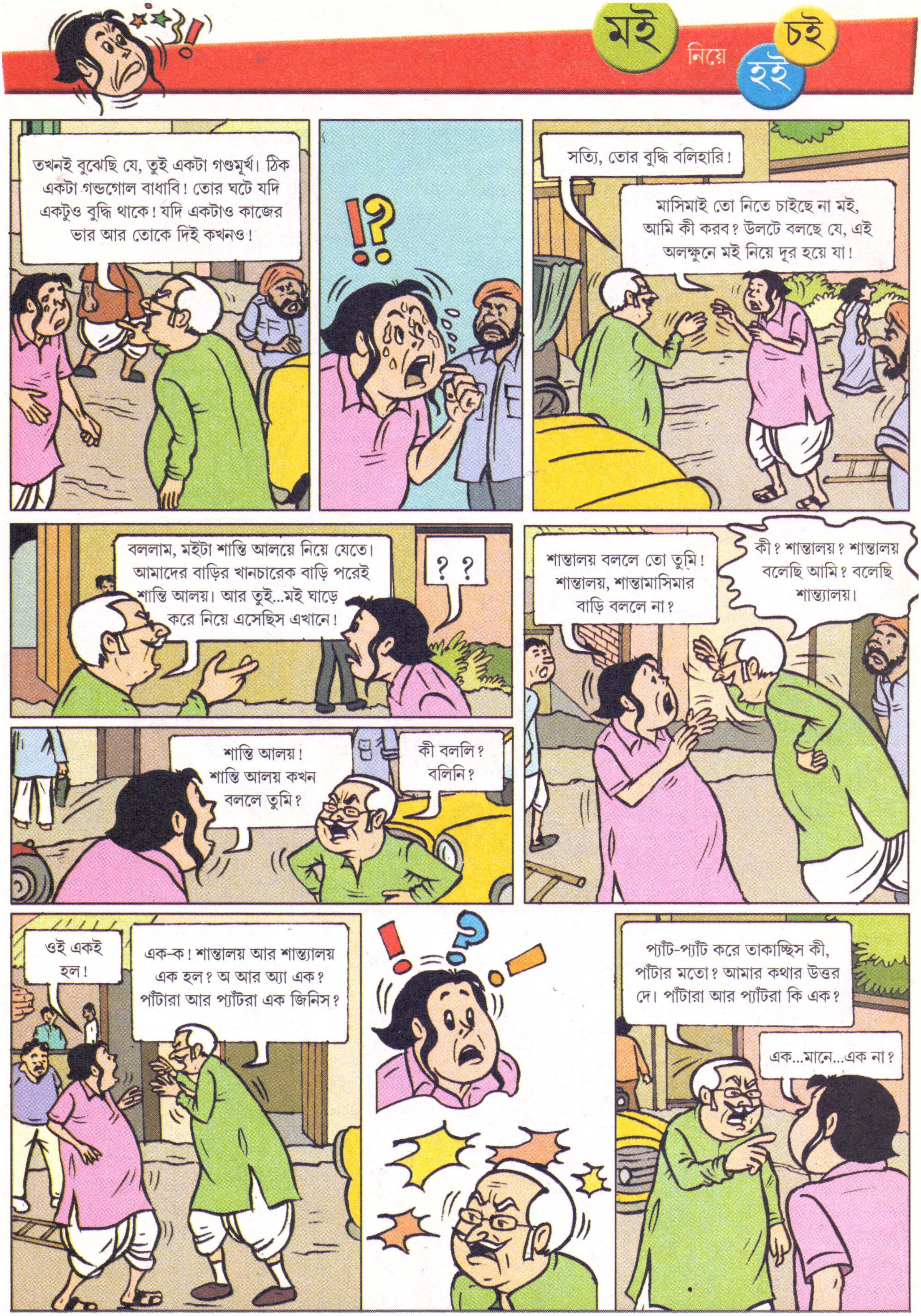
গেলুম রে....এ...এ..এ.
ও মা গো...ও..ও
আমার জুতো?
আমি কী জানি! ওই, ওই লোকটার মই! ওকেই বলো!
আমি...মানে...আমার কী দোষ? মানে, আমার মইয়ের কী দোষ?
মানে, তুমি যদি মইয়ের কাঠিতে পা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে না আসতে তা হলে তো আর দুর্ঘটনা ঘটত না!
আমি ছাড়ব না, পঁচিশ টাকা নেব তোমার কাছ থেকে! আমার একপাটি জুতোর দাম!
না, না, দ্যাখো, তুমি একটু চেষ্টা করলে তো অনায়াসেই মইয়ের ফাঁকে-ফাঁকে পা রেখে আসতে পারতে...!
ওসব শুনব না, দাম দিতেই হবে।
পঁচিশ টাকা তো তোর একপাটি জুতোর দাম রে! অন্য পাটিটা কি আর তোর কোনও কাজে লাগবে? ওটাও তো গিয়েছে!
তাই তো, ঠিক বলেছিস!
এটা, এটাও তা হলে তুমি নাও। তোমাকে দু'পাটির দামই দিতে হবে!
পুরো পঞ্চাশ টাকা!


মই নিয়ে হই চই
পঞ্চাশ টাকা! যা আছে পকেটে, নামার সময় তা তো ওই ব্যাটা কন্ডাকটারকে দিয়ে দিতে হবে!
দু' পাটি জুতোর দামই চাই!
এক পয়সাও নেই আমার কাছে!
তাই আবার হয় নাকি! টাকা না নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছ?
সত্যিই নেই!
তোমার না থাক, তোমার দাদার কাছে আছে। না হয় তোমার বউদির কাছ থেকে এনে দাও!
হ্যাঁ, হ্যাঁ! এখনই!
আমার দাদাই নেই, তো বউদি! আমিই আমার দাদা!
ওসব জানি না, দিতেই হবে!
নিকালো ইসকো হিয়াসে! আভি!
পরের স্টপেই।
এখনই!
আমার জুতো?
ঝগড়া বাড়তে থাকে, সঙ্গে যাত্রীদের বিরক্তি।
ওফ, জ্বালালে দেখছি!
অসহ্য!
ঠিক আছে, ঠিক আছে. থামাও বাস। এখানেই নেমে যাব।
রোকো বাস! আভি!
বাস থামাও!
ক্যাঁচ..........চ.....চ
ইয়ে লে তেরা চিজ়! বেওকুফ কাঁহিকা!


ওফ! প্রাণ একেবারে বের করে দিয়েছে! কিন্তু ব্যাটা কন্ডাকটর কোথায় নামাল?
দাদা, এটা কোন স্টপ?
সাদার্ন অ্যাভিনিউ।
যাক, ব্যাটা ঠিক জায়গাতেই নামিয়েছে তা হলে!
আরে, ব্যাটা কন্ডাকটর তো দশটা টাকা নিল না। নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে। যাক, এবার মই যথাস্থানে পৌঁছে দিলেই ছুটি।
ওই তো, শান্তামাসিমার বাড়ি, খেলার মাঠের পাশে। যাক, চট করে চিনতে পেরেছি।
এই হতচ্ছাড়া মইটাকে পাশে নামিয়ে রাখি।
ক্রিং ক্রিং


মই নিয়ে হই চই
কে র‍্যা?
আমি গো মাসি!
অ তুই? আয়, আয়। আমি ভাবলাম বুঝি...
মাসিমা, তোমার মই এনেছি।
মই?
হ্যাঁ, মই। পিসেমশাই পাঠালেন।
মই দিয়ে কী হবে?
ঘর সাজানোর জন্য দরকার নাকি তোমার? পিসেমশাই যে বললেন!
ঘর সাজাব মই দিয়ে! বলিহারি বুদ্ধি তো তোর পিসের!
তার মানে?
মানে আর কী? মই দিয়ে কেউ ঘর সাজায়? জীবনে শুনেছিস কখনও? যত্ত সব অলক্ষুনে কথাবার্তা!
তা হলে কী করব এখন?
কী করব মানে? যা, নিয়ে যা তোর এই বিদ্ঘুটে মই!
হঠাৎ...
গোওওওওল
দড়াম
এবং...


কেলেঙ্কারি ব্যাপার! এইবেলা মই নিয়ে কেটে পড়ি! নইলে মাসি আর আস্ত রাখবে না!
হতচ্ছাড়া, যতসব অলক্ষুনে ব্যাপার। দাঁড়া দেখাচ্ছি...ও, মা গো!
এক দৌড়ে সোজা রাস্তার মোড়ে এসে...
যাক বাবা, জোর বাঁচা বেঁচেছি!
মাসিমা ধরতে পারলে একেবারে দু'টুকরো করে ফেলত!
আরে, সামালকে ভাই!
কিন্তু সামলানোর আগেই...
ও রে বাবা রে! আঃ আঃ!
দাম
কাঁচ.........চ..চ.চ
আরে ক্যায়সা আদমি হ্যায়, দেখকে নেহি চল সকতা?
TAXI
বাবা রে, গেছি রে!
ও মা! পিসেমশাই? এখানে?
ওফ, প্রায় উড়ে-উড়ে এসেছি তোকে ধরার জন্য!
মানে?


মই নিয়ে হই চই
তখনই বুঝেছি যে, তুই একটা গণ্ডমূর্খ। ঠিক একটা গন্ডগোল বাধাবি! তোর ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! যদি একটাও কাজের ভার আর তোকে দিই কখনও!
!?
সত্যি, তোর বুদ্ধি বলিহারি!
মাসিমাই তো নিতে চাইছে না মই, আমি কী করব? উলটে বলছে যে, এই অলক্ষুনে মই নিয়ে দূর হয়ে যা!
বললাম, মইটা শান্তি আলয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের বাড়ির খানচারেক বাড়ি পরেই শান্তি আলয়। আর তুই...মই ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিস এখানে!
? ?
শান্তি আলয়! শান্তি আলয় কখন বললে তুমি?
কী বললি? বলিনি?
শান্তালয় বললে তো তুমি! শান্তালয়, শান্তামাসিমার বাড়ি বললে না?
কী? শান্তালয়? শান্তালয় বলেছি আমি? বলেছি শান্ত্যালয়।
ওই একই হল!
এক-ক! শান্তালয় আর শান্ত্যালয় এক হল? অ আর অ্যা এক? পাঁটারা আর প্যাঁটরা এক জিনিস?
প্যাঁট-প্যাঁট করে তাকাচ্ছিস কী, পাঁটার মতো? আমার কথার উত্তর দে। পাঁটারা আর প্যাঁটরা কি এক?
এক...মানে...এক না?


কী মানে-মানে করছিস? পাঁটারা আমাদের পেটে যায় আর প্যাঁটরার পেটে আমাদের জিনিসপত্র। এ ছাড়া পাঁটাদের চার-পা আর প্যাঁটরার কোনও পা-ই নেই। পাঁটারা ভ্যা-ভ্যা করে, আর...
হয়েছে, হয়েছে। আর বলতে হবে না। বুঝেছি।
তবেই বোঝো!
হুঁ।
কী হুঁ? আকার আর অ্যাকারে আকাশপাতাল ফারাক। নাকার আর ন্যাকারে কতখানি তফাত! কলেজে তো যাস, পড়িস কী? কী শেখায় শুনি সেখানে?
পাঁটাদের কথা সেখানে পড়ায় না। তোমার প্যাঁটরার কথাও না।
আরে বাবা, সন্ধি তো পড়ায়! শান্তি প্লাস আলয় সন্ধি করলে কী হয়?
সেটা তোমার অভিসন্ধি! কিন্তু তা যদি তোমার পেটের মধ্যে থাকে, তোমার প্যাঁটরার মধ্যে পুরে রাখো, তবে আর টের পাব কী করে!
আরে বাবুজি, যানা হ্যায় তো চলিয়ে, নেহি তো ছোড় দিজিয়ে!
এখনই যাব!
ঢের হয়েছে! এবার এই মইটাকে তো বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।
আবার মই? আমার পক্ষে এই মই নিয়ে হইচই করা আর সম্ভব নয়!


আরে, না রে বাবা না! এবার আমরা দু'জন আছি তো, এই ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব।
ট্যাক্সি করে? কীভাবে? এই মই নিয়ে তো আর ট্যাক্সির ভিতরে বসা যাবে না!
একটাই উপায় আছে...
অতএব...
FRESH M



(সমাপ্ত)

# রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি





# কুইজ়

স্কাইস্ক্র্যাপার থেকে শুরু করে মনোরম প্রাসাদ — সারা পৃথিবী জুড়ে আছে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। বিখ্যাত কয়েকটি স্থাপত্য নিয়েই এবারের কুইজ়।

১ বাড়িটির মূল স্থপতি এডওয়ার্ড ল্যান্ডসিয়ার লুটেন্স। কিন্তু এই বাড়ির অন্যান্য স্থপতি, হারুণ-অল-রশিদ, সুজন সিংহ, শোভা সিংহ প্রমুখের নাম আজ প্রায় বিস্মৃতির অতলে। কোন বাড়ি?

২ প্রথমে জায়গাটির নাম ছিল ম্যাকোয়ারি দুর্গ। পরে এখানে তৈরি হয় বেনেলং পয়েন্ট ট্রাম ডিপো। এখন এ-জায়গায় কী দেখা যাবে?

৩ ১৬০০ পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউয়ের এই বাড়িটি তৈরির ন'টি নকশা থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল স্থপতি জেম্‌স হোবানের নকশাটি। কোন বাড়ি?

৪ কোন বিখ্যাত বিল্ডিংয়ে ছিল 'উইন্ডোজ় অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' রেস্তরাঁ?

৫ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস বাড়িটির স্থপতি জর্জ বার্গস্ট্রম। কোন বাড়ির কথা বলা হচ্ছে?

৬ পঞ্চম দলাই লামার সময় (১৬৪২-১৬৫০ সাল) এই প্রাসাদটি তৈরি হয়। এই বাড়িটিকে দলাই লামার বাসস্থান ধরা হয়। কোন বাড়ি?

৭ ১৯২৮ সালে ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেল ভেঙে এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে একটি সিনেমায় কিং কং-কে এই বাড়িটির মাথায় দেখা গিয়েছিল। কোন বাড়ি?

৮ নিউ ইয়র্কের ফার্স্ট অ্যাভিনিউ থেকে ইস্ট রিভার পর্যন্ত বিস্তৃত ১৮ একর জায়গাটিতে কোন বিখ্যাত বাড়ি আছে?

**অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী**



## গত সংখ্যার উত্তর

১. কলকাতা।
২. রিও-ডি-জেনেইরো।
৩. টোকিও।
৪. প্যারিস।
৫. ভেনিস।
৬. ১৯৮৯ সালে।
৭. কায়রো।
৮. নিউ ইয়র্ক।

## জবাব চাই

১. পেট্রোনাস টাওয়ার্স কোন শহরে অবস্থিত?
২. বলিউডের কোন অভিনেতা তথা রাজনীতিক 'বিরার কা ছোকরা' নামে পরিচিত?
৩. 'ইন্টারপোল'-এর পুরো অর্থ কী?

*(উত্তর আগামী সংখ্যায়)*

## গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. লন্ডন ও প্যারিস। ২. রোম।
৩. মন্টিভিডিও।

## সঠিক উত্তরদাতা

**সুকন্যা দাস,** অষ্টম শ্রেণি, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, দমদম; **জয়দীপ ভট্টাচার্য,** দশম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা; **সুতনু বন্দ্যোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল; **অপরূপ আইচ,** রিষড়া বাণীভারতী হাই স্কুল, হুগলি; **সমীরণ বোস,** অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দুর্গাপুর; **শাশ্বাদিত্য দাস,** দশম শ্রেণি, দ্য সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, মালদহ; **সুদীপ দে,** নবম শ্রেণি, হাওড়া জিলা স্কুল; **কৌশিক চক্রবর্তী,** নবম শ্রেণি, রাজপুর বিদ্যানিধি উচ্চ বিদ্যালয়, সোনারপুর; **মুনীপ ঘোষ,** নবম শ্রেণি, পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ, বারাসাত; **ঋতুপর্ণা দে,** অষ্টম শ্রেণি, শ্রীরামপুর গার্লস হাই স্কুল; **সর্বজিৎ রায়,** দ্বাদশ শ্রেণি, মহাত্মা গাঁধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল, বারাসাত; **সম্পূর্ণা রায়,** দ্বাদশ শ্রেণি, বারাসাত কালীকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুল; **রত্নদ্বীপ দে,** পঞ্চম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হুগলি; **কিঞ্জল মজুমদার,** পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দুর্গাপুর; **প্রত্যয় মুখোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন হাই স্কুল, কলকাতা; **সোমনাথ ঠাকুর,** চতুর্থ শ্রেণি, হোলি হোম, কলকাতা; **সায়ক চট্টোপাধ্যায়,** ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন; **সপ্তর্ষি চট্টরাজ,** সপ্তম শ্রেণি,



বোলপুর হাই স্কুল; **সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়,** নবম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, শিলিগুড়ি; **সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়,** বার্নপুর রিভারসাইড স্কুল; **চৈতালি রায়,** সপ্তম শ্রেণি, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল; **বিদিশা বসু,** অষ্টম শ্রেণি, রিষড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি; **শুভদীপ সেনগুপ্ত,** দশম শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল; **সর্বাণী ঘোষ,** নবম শ্রেণি, অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল (টালিগঞ্জ), কলকাতা; **রাজসী সামন্ত,** দশম শ্রেণি, বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া; **সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, মেথডিস্ট স্কুল, ডানকুনি; **অনুভব জানা,** একাদশ শ্রেণি, বাগনান হাই স্কুল, হাওড়া; **বিপ্লব সাহা,** চাঁদপাড়া বাণীবীথি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল:
**anandamela@abpmail.com**

## আনন্দমেলা ক্লাবের সঙ্গে ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে গিয়েছিল বেহালার বিদ্যাভবন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কেমন কাটল তাদের?

বিস্কুট খেতে কে না ভালবাসে? কিন্তু কীভাবে তৈরি করা হয় বিস্কুট, তা জানে না অনেকেই। আনন্দমেলা ক্লাব একদিন আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল বিস্কুট কোম্পানি ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর উদ্দেশে।

সেখানে একজন কর্মচারী বিস্কুট তৈরির প্রণালী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। প্রথমে কাঁচামালগুলি মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ রং, অল্প পরিমাণ জল ও স্বাদের জন্য একটি তরল পদার্থ মেশানো হয়। পরে এই মিশ্রণটি মেশিনের সাহায্যে ভাল করে মাখানো হয়। এর পর সেই মিশ্রণকে রোলিং মেশিনের সাহায্যে পেষাই করে ভিন্ন আকৃতির ডাইসের তলায় রেখে চাপ দেওয়া হয়। ফলে, বিভিন্ন আকৃতির বিস্কুট তৈরি হয়। এর পর সেগুলোকে এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তৈরি হয়ে যাওয়া বিস্কুটগুলো কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে প্যাকিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

**অমিত চৌধুরী**
*সপ্তম শ্রেণী*

আনন্দমেলা ক্লাবের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসের দু' তারিখে আমাদের স্কুল থেকে প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারাতলায় ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানায়।

প্রথমে আমরা স্টোররুমে গিয়ে দেখলাম, সেখানে বিস্কুট তৈরির সমস্ত উপাদান কীভাবে মেশানো হয়। রোলারের সাহায্যে মিশ্রণটিকে একটি পাতলা শিটে পরিণত করা হয়। এর পর শিটটিকে বিস্কুটের আকারে গোল করে কেটে নেওয়া হয়। তারপর ওভেনে দিয়ে বিস্কুটগুলোকে গরম করা হয়। এবার একটা মেশিনের সাহায্যে যাচাই করে নেওয়া হয়, যে বিস্কুটটা তৈরি করা হল তার মধ্যে কোনও মেটাল আছে কি না! এর পর প্যাকেটে ভরা হল বিস্কুটগুলোকে।

**পায়েল চট্টোপাধ্যায়**
*ষষ্ঠ শ্রেণি*




আনন্দমেলা ক্লাবের তরফ থেকে বাসে করে ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের। সেখানে আমরা ছাত্রছাত্রীরা একে- একে লাইন দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। কীভাবে বিস্কুট তৈরি করা হয় তা দেখানো হল আমাদের। প্রথমে ছাত্রদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর আমরা ছাত্রীরা গেলাম। কতরকম জিনিস দিয়ে বিস্কুট তৈরি হয়, তা দেখলাম। প্রথমে একটা বড় মেশিনে ময়দা ঢেলে নিয়ে তেল, নুন, চিনি, ইস্ট দিয়ে ওই ময়দা মেখে নেওয়া হল। এর পর অন্য একটা মেশিনে ওগুলো দিয়ে দেওয়া হল। এবার বিস্কুট তৈরির পালা। এক সময় ওই বাসে চেপেই আমরা আবার ফিরে এলাম স্কুলে।

ওই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আনন্দমেলা ক্লাবকে ধন্যবাদ।

**স্বাতীলেখা ঘোষ**
*ষষ্ঠ শ্রেণি*

সেদিন আনন্দমেলা ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বাসে করে তারাতলায় ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানিতে নিয়ে গিয়েছিল। সকাল ন'টায় বাস ছাড়ল। বাসে খুব মজা হল। বাস থেকে নেমে লাইন করে ভিতরে ঢুকলাম। ঘুরে-ঘুরে দেখলাম চারদিক। ওই কোম্পানিরই একজন কর্মী ভিতরে নিয়ে গেলেন আমাদের।

প্রথমে আমরা দেখলাম বিস্কুট তৈরির জন্য কত ময়দা আর আটা স্টোর করে রাখা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ময়দা মাখার পদ্ধতিও দেখলাম। জানতে পারলাম কীভাবে ধাপে-ধাপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বিস্কুট।

**অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায়**
*সপ্তম শ্রেণি*



# রহস্যময়ী মেডুসা

সুখলতা মজুমদার

প্রতি অমাবস্যায় রাত সাড়ে দশটায় ডা: জীবানন্দ ভৌমিকের বাড়ির টেলিফোনটা বেজে ওঠে। আজ দু'মাস ধরে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে ফোন করেন। ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় রাত সাড়ে দশটায়। আশ্চর্য, প্রতিবার ফোনটা বেজে উঠলে একটা অস্বস্তির দোলা শুরু হয়ে যায় বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডা: জীবানন্দ ভৌমিকের মনে। প্রথমবার, ভদ্রলোক তাঁকে ফোন করেন ১৭ জুলাই। সেদিন ছিল অমাবস্যা। তিনি তাঁকে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হ্যালো, আপনি কি ডা: জীবানন্দ ভৌমিক, সাইকিয়াট্রিস্ট?"

ডা: ভৌমিক তখনই জবাব দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, আমি ডা: ভৌমিক কথা বলছি। আপনি কে?"

লোকটি অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন, "ডা: ভৌমিক, আমি ভীষণ বিপদগ্রস্ত, চারদিক দিয়ে নানা ধরনের বিপদ আমায় তাড়া করছে, আমি দিশেহারা। আপনি আমায় বাঁচান।"

ডা: জীবানন্দ ভৌমিকের মনে হয়েছিল, লোকটি সম্ভবত ফিয়ার-সাইকোসিসে ভুগছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি কালই আমার চেম্বারে চলে আসুন, আমি দেখব আপনাকে।"

কোনও উত্তর না দিয়ে রিসিভার রেখে দিয়েছিলেন সেই লোকটি। অথচ তাঁর কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যাকুলতা ধ্বনিত হচ্ছিল।

আবার ১৬ অগস্ট অমাবস্যার রাতে ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। জীবানন্দ ফোন ধরে ওঁর গলার আওয়াজ পেয়ে রিসিভারটা রেখে দিয়েছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর আবার তাঁর ফোন আসে। সেদিনও ছিল অমাবস্যা। এবার জীবানন্দ ফোনটা ধরেননি। বেজে-বেজে থেমে গিয়েছিল। তিনি বুঝতে পারলেন না, ভদ্রলোক অযথা অমাবস্যার রাতে তাঁকে ফোন করে কেন বিরক্ত করছেন? তিনি কে? কী তাঁর বিপদ? তিনি কেন সব কিছু খুলে বলছেন না! তৃতীয়বার ফোন বেজে উঠতেই জীবানন্দ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে ওই ভদ্রলোকের ফোন নম্বর খুঁজে বের করে দিতে বলেন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জও ১৫ দিনের মধ্যেই তাঁকে



লোকটির ফোন নম্বর ও ঠিকানা জানিয়ে দেয়।

জীবানন্দ জানতে পারলেন, ভদ্রলোকের নাম ডা: অতীন সরকার। তিনি ২/বি, নফর মল্লিক স্ট্রিটে থাকেন। এর বেশি কিছু আর তিনি জানতে পারেননি।

আজ আবার অমাবস্যা। ১৪ অক্টোবর অ্যাটেনড্যান্ট বোধন দাস ছুটি নিয়েছেন। তিনি প্রতি অমাবস্যায় মন্দিরে পুজো দেন। সকাল থেকে জীবানন্দের মনে একটা অস্বস্তি, একটা প্রিমোনিশন বলা যায়। কিছু একটা ঘটনা আজ ঘটবে, কিন্তু কী ঘটবে, তিনি জানেন না। চেম্বারে বসে তিনি চার-পাঁচটা রুগি দেখলেন, যদিও কাজে মন বসছে না। বারবার ইচ্ছে না করলেও সেই লোকটির কথা ভাবছেন মনে-মনে।

আজও নিশ্চয়ই ডা: অতীন সরকার ফোন করবেন। যদি তিনি ফোন করেন, জীবানন্দ তাঁকে ধমকে দেবেন বলে ঠিক করলেন। তখন সন্ধে সাতটা। চেম্বারে ভিড় কম। শেষ ক'টা রুগি দেখে নিয়ে জীবানন্দ ভাবছিলেন, চেম্বার বন্ধ করে বাড়ি যাবেন কি না। আচমকা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা: নিরুপম চৌধুরীর ফোন এল। উনি একজন নামী নিউরো-ফিজিশিয়ান। প্রতি শনি-রবি তাঁর বাড়িতে জীবানন্দ সন্ধেটা কাটান। মিসেস চৌধুরী দারুণ রান্না করেন। জীবানন্দ আপত্তি করলেও তিনি ওঁকে না খাইয়ে ছাড়েন না।

এদিকে ডা: চৌধুরী ফোনে অনুরোধ করলেন জীবানন্দকে, "ওহে জীবানন্দ, আজ রাতটা আমার বাড়ি এসে খেয়ে যাও। আমার গিন্নি চমৎকার পোলাও-মাংস রান্না করেছেন।"

জীবানন্দ বিয়ে করেননি, তাই তাঁর পিছুটান নেই। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ছিলেন এক পিসিমা, তিনিও এখন বেঁচে নেই। জীবানন্দ বন্ধুর নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজি হয়ে গেলেন তখনই। চেম্বার থেকে বেরিয়ে উনি আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশটা থমথমে। মনে হয় জোর বৃষ্টি নামবে। এই সময় তারারা কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। গাড়ির কাছে পৌঁছে ড্রাইভার নগেনকে বললেন, "চলো, ডা: চৌধুরীর বাড়ি।"

উনি যখন বন্ধুর বাড়ি পৌঁছলেন, তখন বৃষ্টি জোরে পড়ছে। ডা: নিরুপম চৌধুরী তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নিজেও বসলেন। এর পর দু'জনে গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন। জীবানন্দ দৈব বা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু নিরুপম করেন। নিজের দেখা ও শোনা কয়েকটি ঘটনার কথা বলছিলেন উনি।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে-হতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীবানন্দ চমকে উঠলেন, এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। নিরুপমকে বললেন, "ওহে নিরুপম, এবার আমি উঠি।"

ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল বেশ জোরে। নিরুপম উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন, বললেন, "হ্যালো।"

ওধার থেকে একটা অনুনয়ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অনুগ্রহ করে ডা: ভৌমিককে ফোনটা একবার দেবেন?"

নিরুপম রিসিভারটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন, "জীবানন্দ, তোমার ফোন।"

জীবানন্দ অবাক হয়ে বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার, আমি তোমার বাড়িতে আছি, লোকটা কী করে জানল?"

"লোকটা কে?" নিরুপম জিজ্ঞেস করলেন।

"বলছি," জীবানন্দ বললেন।

ফোনটা ধরতেই সেই পরিচিত অনুনয়ভরা গলার স্বর শুনতে পেলেন উনি, "হ্যালো ডাক্তারবাবু, আমি বলছি।"

জীবানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনার পরিচয় ও ফোন নম্বর আমি জোগাড় করেছি ডা: সরকার। আপনি কী করে জানলেন আমি কোথায় আছি? আমি তো কাউকে বলে আসিনি।"

"আপনি ডা: নিরুপম চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু, একথা অনেকেই জানে। আপনি যখন আমার নাম-ঠিকানা জানেন, তা হলে আজ আমার বাড়ি অনুগ্রহ করে চলে আসুন," বক্তার গলার আওয়াজ যেন দূর থেকে ভেসে এল।

জীবানন্দ দৃঢ় স্বরে বললেন, "আমি এত রাতে কোনও রুগির বাড়ি যাই না।"

ডা: অতীন সরকার নামধারী ভদ্রলোক আরও অনুনয়ের স্বরে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমি সত্যিই খুব বিপদগ্রস্ত। তা ছাড়া আমি পঙ্গু, অসহায়। কোথাও যেতে অক্ষম। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার বাড়ি এসে আমায় বাঁচান।"

"কী আপনার বিপদ খুলে বলুন।"

"ফোনে সব কথা বলা যায় কি?"

জীবানন্দ গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি কাল সন্ধের সময় আপনাকে দেখতে যাব। আজ আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়," বলে উনি ফোনটা রেখে দিলেন।

নিরুপম জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটি কে?"

জীবানন্দ বললেন, "কে এক অতীন সরকার। বলেন, উনি নাকি খুব বিপদে পড়েছেন। ওঁকে বাঁচাতে আমাকে যেতে বলছেন।"

"পাগল, এত রাতে কেউ রুগির বাড়ি যায়! বিশেষত, তোমার হার্টের অবস্থা ভাল নয়।"

আবার ফোনটা বেজে উঠল। ডা: অতীন সরকারের ফোন। জীবানন্দ এবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডা: সরকার, আপনি প্রতি অমাবস্যার রাতে, সাড়ে দশটায় ফোন করেন কেন?"

ও-প্রান্ত থেকে আর্তস্বর ভেসে এল, "প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই ভয়ংকর বিপদ এসে আমায় তাড়া করে। অনুগ্রহ করে আপনি আমায় বাঁচান। কাল এলে হবে না, তা হলে বড় দেরি হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা আমি আসছি," বলে জীবানন্দ ফোন রেখে দিলেন।

নিরুপম বন্ধুকে বললেন, "জীবানন্দ, এত রাতে তুমি রুগির বাড়ি যেও না।"

জীবানন্দ বললেন, "কথা দিয়ে ফেলেছি। লোকটির কী কাল্পনিক বিপদ, সেটা আমাকে জানতে হবে। উনি যে মনোবিকারগ্রস্ত, সেটা আমার বুঝতে বাকি নেই। আমি গেলে উনি হয়তো স্বস্তিবোধ করবেন। ওঁর বাড়ি বেশি দূরে নয়। আমার ওখানে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। ওঁকে পরীক্ষা করেই আমি বাড়ি ফিরে যাব।"

নিরুপমের বাড়ি থেকে জীবানন্দ যখন বেরোলেন, তখন প্রায় এগারোটা। গাড়ির কাছে গিয়ে ড্রাইভার নগেনকে বললেন, "চলো, বউবাজার হয়ে নফর মল্লিক স্ট্রিট।"

নগেন অনেক দিনের পুরনো বিশ্বস্ত লোক। সে জীবানন্দর কথা শুনে ইতস্তত করে বলে উঠল, "রাত হয়েছে, বৃষ্টি পড়ছে, এখন রুগি দেখতে যাওয়া উচিত কি স্যার? আপনার শরীর ভাল নয়।"

"আমার শরীর ঠিকই আছে নগেন। চলো, আর দেরি কোরো না।" জীবানন্দ নগেনের আপত্তি আমল দিলেন না।

গাড়িতে স্টার্ট দিল নগেন। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে বউবাজারের দিকে জোরে ছুটে চলল গাড়ি। জীবানন্দ ভাবছিলেন, লোকটার কথা শুনে ওঁর বাড়িতে এত রাতে না ভেবেচিন্তে হুট করে ছুটে যাওয়া হঠকারিতার কাজ হচ্ছে না তো? সাধারণত, তিনি ভেবেচিন্তেই পা ফেলেন। আসলে, ভদ্রলোকের কাতর আবেদন তিনি অবহেলা করতে পারেননি। তা ছাড়া, তিনি প্রচণ্ড কৌতূহল অনুভব করেছিলেন ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে।

গাড়ি বউবাজার পৌঁছে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের দিকে ঘুরে গেল। পিচঢালা রাস্তা, অনেক জায়গা জলমগ্ন। রাস্তার লাইটপোস্টের আলোর সঙ্গে জমে ওঠা পুঞ্জীভূত ধোঁয়াশা মিলেমিশে একটা আবছা আলো-অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। রাস্তার দু'দিকে জমা জঞ্জাল। লোক চলাচল কম হয়ে আসছে। একটা-দু'টো রিকশা ঘন্টি বাজিয়ে নিজের-নিজের আস্তানায় ফিরছে। মদন দত্ত লেনের গলি পার হয়ে গাড়ি নফর মল্লিক স্ট্রিটে ঢুকল। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। রাস্তাটা একটা ব্লাইন্ড লেন।

অনেক পুরনো ধাঁচের বিবর্ণ বাড়ি পরের পর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। তিনটে বাড়ি পার করে জীবানন্দের নির্দেশমতো একটা দোতলা বাড়ির সামনে নগেন গাড়িটা থামাল। ঘড়িতে তখন ঠিক এগারোটা দশ।

বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো শুনশান। বাড়ির সামনে নেমপ্লেটে লেখা ডা: অতীন সরকার, ২/বি, নফর মল্লিক স্ট্রিট। অতীতের অন্ধকার হাতড়ে জীবানন্দের মনে হল, নামটা কোথায় যেন শুনেছেন। আশ্চর্য, বাড়ির সদর দরজা ভেজানো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নগেনকে জীবানন্দ বললেন, "তুমি গাড়ির ভিতর বসে অপেক্ষা করো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি না ফিরলে আমার খোঁজ করবে।"

কেন কথাটা বললেন, নিজেই জানেন না উনি। নগেন শুধু বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

একটা জোরালো আলোর টর্চ জীবানন্দের সঙ্গে থাকে। সেই টর্চটা আর ডাক্তারি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন উনি। ঢুকেই মনে হল, বাড়িটা বড্ড মৌন, নিস্তব্ধ। কোথাও কোনও জনপ্রাণী দেখতে পেলেন না তিনি। সামনেই হলঘর, একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। কীরকম দম বন্ধ করা আবহাওয়া। জীবানন্দ চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ডা: সরকার, ডা: সরকার, আপনি কোথায়?"

কোনও একটা ঘর থেকে খুব শান্ত ভরাট একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "ডাক্তারবাবু, পরের ঘরটিতে আমি। দরজা খোলা আছে। সোজা চলে আসুন ভিতরে।"

সঙ্গে-সঙ্গে জীবানন্দের তীব্র অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি আটকে গেল একটা বিড়ালের স্ট্যাচু দেখে। রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে বিড়ালটা। চোখের মণিটা স্থির। আশ্চর্য, তারপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পরপর তিনটে পাথরের মূর্তি। কোনও কুশলী ভাস্করের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এগুলো। প্রথমে একটা বয়স্ক মানুষের মূর্তি। একটা পা সামনের দিকে বাড়ানো, যেন কোথাও যাবে। তার কাঁধে গামছা, পরনে লুঙ্গি। দেখে মনে হয়, বাড়ির কাজের লোক। এত জীবন্ত এই মূর্তির মুখের হাবভাব, মনে হয় এখনই কথা বলে উঠবে! মূর্তিটা একটা ঘরের দরজার কাছে দাঁড় করানো, যেন ঘরের পাহারাদার। তার একটু দূরে আরও দু'জন মানুষের দু'টি নিশ্চল পাথরের মূর্তি দেখে বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: জীবানন্দ ভৌমিকের মনে হল, এদের তিনি ভালভাবেই চেনেন।

প্রথম মূর্তিটা ডা: কমল বসুর, একজন নিউরো-ফিজিশিয়ান। অপরটি ডা: জীবন ব্যানার্জির, একজন নামী সাইকিয়াট্রিস্ট। দু'টো মূর্তি দু'জন মানুষের প্রতিরূপ। মাসখানেক আগে এঁরা দু'জন একসঙ্গে আচমকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এঁদের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর চারদিকে আলোড়ন তুলেছিল। মূর্তি দু'টোর চোখের স্থির মণির দিকে তাকিয়ে জীবানন্দ হঠাৎ শিউরে উঠলেন। কীরকম অপার্থিব শীতল দৃষ্টি ওঁদের। তখনই ওঁর মনে কোনও এক বিপদের সঙ্কেতধ্বনি বেজে উঠল। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক রোগের চিকিৎসক জীবানন্দ জোর করে মনের সব আশঙ্কা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তিনি সামনের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলেন ভিতরে। দেখলেন, একটি বড় পালঙ্কে একজন সৌম্য চেহারার বয়স্ক লোক শুয়ে। মুখে ক'দিনের না-কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে কালো রঙের গগল্স। বড় শীর্ণ, রুগ্ন সেই ভদ্রলোক। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র খুব কম। একটা বড় টেবিল, খাটের পাশে একটা টুল আর দেওয়ালে টাঙানো বড় একটা আয়না। টেবিলে একটা টেলিফোন ও একটা মাঝারি সাইজের চৌকো বাক্স রাখা। এ ঘরেও একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে মিটমিট করে। ঘরের দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি। খাটে শোয়া রুগ্ন লোকটি বোধ হয় ডা: অতীন সরকার। ইনিই কি বারবার ফোন করে তাঁকে বিরক্ত করতেন? আশ্চর্য, ভদ্রলোক রাত্রে চোখে কালো গগল্স পরে আছেন কেন? ওঁর চোখে কোনও অসুখ আছে নাকি?

ভদ্রলোক জীবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নমস্কার ডা: ভৌমিক। আমি ডা: অতীন সরকার, বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো আপনার?"

পালঙ্কের পাশে রাখা ছোট টুলে বসে জীবানন্দ প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, "না, কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আপনার বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল কেন? বাড়ির আর লোকজন কোথায়?"

ডা: সরকার বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলেন, "আমার আর কেউ নেই। তা ছাড়া এ বাড়িতে কিছু চুরি করার নেই, তাই সদর দরজা খোলা। কে বন্ধ করবে বলুন? কেউ এ বাড়িতে থাকে না, এক আমি ছাড়া। সে যাক, আপনি আসায় খুব খুশি হলাম। এদিকে, আমার বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হওয়ার জন্য বিছানায় পড়ে আছি। আমি বড় অসহায়, বড় একলা।"

ওঁর গলার স্বর খুব ক্ষীণ, কিন্তু স্পষ্ট। জীবানন্দ সহানুভূতির সুরে বললেন, "আপনার অসুস্থতার খবর জেনে খুব খারাপ লাগল। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। এখন বলুন, আপনার কিসের বিপদ? প্রতি অমাবস্যায়, রাত সাড়ে দশটার সময় আমায় ফোন করতেন কেন? আপনি এই

রাতে চোখে গগল্‌স লাগিয়েছেন কেন? আপনার চোখের অসুখ আছে?”

ভদ্রলোক ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন, “আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দিচ্ছি। আপনি আমায় দেখছি চিনতে পারেননি। প্রথমে আপনাকে জানাই, আমি কয়েক বছর আগে মালদার জগজীবনপুরের তুলাভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ওখানকার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে আমার একটা বই আছে,” বলে ডা: সরকার থামলেন।

উনি যে খুব দুর্বল, সেটা ওঁর গলার স্বরে বেশ বোঝা যাচ্ছিল। এবার জীবানন্দ ডা: অতীন সরকারকে চিনতে পারলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডা: অতীন সরকার, যিনি হঠাৎ লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন?

ডা: সরকার রাগত স্বরে বললেন, “ইচ্ছে করে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাইনি, যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেজন্য তো আপনারাই দায়ী ডা: ভৌমিক। আমি মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি সেটা প্রমাণ করতে যে মেডিক্যাল বোর্ড বসেছিল, তাতে আপনি একজন সদস্য ছিলেন, সেটা আপনার মনে পড়ছে? অপর দু'জন ছিলেন ডা: কমল বসু ও ডা: জীবন ব্যানার্জি।”

জীবানন্দ কিছু বলার উপক্রম করতেই ডা: সরকার তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “না, না, এখনই কিছু বলবেন না। আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। মেডিক্যাল বোর্ড মিথ্যে অভিযোগ এনেছিল আমার বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত চলছিল। ফলে, আমার ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ পদের চাকরিটা চলে যায়। খ্যাতির উচ্চ শিখরে তখন আমি ছিলাম। সেই ক্ষতি অপূরণীয়। সে যাক, এখন আসল কথায় আসি। গত বছর কয়েক মাস ধরে পুরুলিয়ায় পুঞ্চা এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয়েছিল দু'জন প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধানে, জানেন বোধ হয়। জায়গাটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রচুর শিলাচিত্র, মানে রক আর্টের জন্য বিখ্যাত। সেই সময় খুঁড়তে-খুঁড়তে হাড়ের উপর খোদাই করা গ্রিক দেবী ভেনাসের এক অনবদ্য মূর্তি পাওয়া যায়। তুলাভিটায় গ্রিক মূর্তিকলার নিদর্শন পাওয়া একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। খোঁড়া শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গ্রামের লোকেরা চোরাপথে বিক্রি করছিল। চাকরি করার সময় ওখানে আমি মাঝে-মাঝে যেতাম ও প্রাচীন শিলাচিত্রগুলো পরীক্ষা করে সেগুলোর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টা করতাম। এবার জুন মাসে বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই আমি আবার পুঞ্চায় যাই। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। সেই সময় একজন আধবুড়ো লোক আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে বলল যে, মাটি খুঁড়ে সে দু'দিন আগে কারুকার্যখচিত কাঠের বাক্স পেয়েছে। সেই জিনিসটা আমায় সে বিক্রি করতে চায়। মাটির তলায় থাকলেও বাক্সটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।”

“তারপর?” জীবানন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ডা: সরকার বলতে লাগলেন, “কৌতূহলী হয়ে আমি লোকটির সঙ্গে তার ঘরে গেলাম। সে তার ঘর থেকে বাক্সটি আমায় এনে দেখাল। বলল, সে বহু চেষ্টা করেও বাক্সটি খুলতে পারেনি। সুতরাং বাক্সটির ভিতরে কী আছে সে জানে না। আমি লক্ষ করলাম, বাক্সটার উপরে প্রাচীন গ্রিক লিপিতে দু'-তিনটি লাইন লেখা আছে। আমি তখনই জিনিসটা ওর কাছ থেকে কিনে নিলাম। তারপর ওটি নিয়ে কলকাতা চলে এলাম। আকারে ছোট হলেও বাক্সটা ভারী ছিল।”

জীবানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, “তুলাভিটার মতো জায়গায় গ্রিক লিপি লেখাসমেত বাক্স পাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি?”

ডা: সরকার বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, “আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওখানে গ্রিক দেবী ভেনাসের হাড়ের তৈরি একটা ফিগারিন আগে পাওয়া গিয়েছিল। হতে পারে, সেই সময় গ্রিসের সঙ্গে বাংলার নৌ-যোগাযোগ ছিল। এ-বিষয়ে কোনও গবেষণা হয়নি। যাক, বাড়ি পৌঁছে বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে দিলাম। একাদশীকে বললাম, আমি রাতে কিছু খাব না, আমাকে সে যেন বিরক্ত না করে।”

“একাদশী কে?”

“আমার কাজের লোক। বহু দিনের পুরনো। যাক, আমি হাতুড়ি, চাবির গোছা ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে বাক্সটা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিছুতেই সেটা খোলা গেল না। বাক্সটা টাইট করে ভিতরে থেকে যেন বন্ধ। অথচ, বাক্সটার ভিতর কী আছে জানার জন্য আমার কৌতূহল আরও বেড়ে উঠেছে। বুঝলেন, সেদিন ১৭ জুন, অমাবস্যার রাত।”

জীবানন্দ ভাবলেন, বাক্সটা নিয়ে রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। সেদিন অমাবস্যার রাত ছিল শুনে জীবানন্দ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, “অমাবস্যার রাত ছিল সেদিন? আপনি বলছিলেন না, অমাবস্যার রাতে আপনাকে ভয়ংকর বিপদ তাড়া করে?”

ডা: সরকার হাত নেড়ে বললেন, “সবই আপনাকে খুলে বলব। সেদিন রাতে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছি। ঘরে অল্প আলোর বাল্‌বটা জ্বলছে। আমার অভ্যেস, আলো জ্বালিয়ে শোওয়া। ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। নিশুতি রাত। ঘরে একটা থমথমে আবহাওয়া। উঠে দেখলাম, সেই রহস্যময় বাক্সটার ডালা খোলা। আর, একটা কাটা মাথা শূন্যে ভাসছে। বুঝলাম, বাক্সটার ডালা খুলে মাথাটা বেরিয়েছে। আশ্চর্যের সঙ্গে অল্প আলোয় দেখতে পেলাম, মুন্ডুটার মাথায় চুলের বদলে অজস্র লিকলিকে সাপ কিলবিল করছে। ভাল করে দেখার জন্য পাওয়ার গগল্‌সটা পরে নিলাম। তখনই দেখলাম, ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নায় একটা বীভৎসদর্শন বুড়ির মুখের প্রতিচ্ছবি আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বুঝতে পারলাম, ওটা ডাইনি মেডুসার মুখ, বাক্সটার ভিতর বন্ধ ছিল।”

“আপনি মেডুসার মাথা দেখতে পেলেন? একথা আমায় বিশ্বাস করতে বলেন?” অবিশ্বাসভরে জীবানন্দ বলে উঠলেন।

“হ্যাঁ, আমি মেডুসার কাটা মাথা শূন্যেও ভাসতে দেখেছিলাম, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তখন ঘড়িতে ঠিক রাত বারোটা। গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত তিন গর্গন ডাইনি বোনের কথা আমরা পড়েছি। ওদের মাথায় চুলের বদলে থাকত হিলহিলে সাপ। গর্গন মানে কুৎসিৎদর্শন দানবী। মেডুসা তাদের মধ্যে একজন। আপনি চিকিৎসক। গ্রিক পুরাণ হয়তো পড়েননি। তাতে লেখা আছে,

গ্রিক বীর পার্সিউস চোখ বন্ধ করে মেডুসার মাথা কেটে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ, মেডুসার চোখের দিকে তাকালে যে-কোনও মানুষ পাথর হয়ে যায়। কী করে সেই কাটা মাথা এই বাক্সের ভিতরে এল, তা জানি না। বাক্সটার উপর লেখা ছিল, 'এই বাক্সতে মেডুসার কাটা জ্যান্ত মাথা বন্ধ করে রাখা হল।'

জীবানন্দ উপহাসের হাসি হেসে বললেন, "মেডুসার কাটা জ্যান্ত মাথা! তাও বাক্সর ভিতর? আপনি আজগুবি গপ্পো দিব্যি বলতে পারেন তো!"

"আজগুবি নয় ডা: ভৌমিক! প্রতি অমাবস্যার গভীর রাতে বারোটার সময় জীবন পেয়ে বাক্সের ডালা খুলে মেডুসার কাটা মাথা বেরিয়ে আসে। কোনও মানুষের দিকে সে তাকালে সেই মানুষ পাথর হয়ে যায়। আর কখনও সে জীবন ফিরে পায় না।"

জীবানন্দের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব আজগুবি কথা বলবেন বলে মিথ্যে আমায় ডেকে আনলেন?"

"ডাক্তার ভৌমিক, আপনি বড় বোকা!" বিদ্রুপের ভঙ্গিতে ডাক্তার সরকার বললেন। তাঁর হাসিতে বিজয়োল্লাসের ঝিলিক।

ডা: জীবানন্দ সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, "আমার প্রশ্ন, বাইরের হলঘরে ডা: জীবন ব্যানার্জি ও ডা: কমল বসুর স্ট্যাচু দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কী উদ্দেশ্যে? আপনি কি বলতে চান ওঁদের আপনি একসঙ্গে অমাবস্যার রাতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনার বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন? আপনি কি মনে করেন যে, আমি বিশ্বাস করব, মেডুসার চোখের দিকে তাকানোর জন্য ওঁরা পাথর হয়ে গিয়েছেন? একথা বলে আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?"

ডা: সরকার গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি ভয় পেয়েছেন বলে একথা বললেন। শুনুন, আমি যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। হ্যাঁ, ডা: বসু ও ডা: ব্যানার্জিকে আমি একসঙ্গে অমাবস্যার রাতে ডেকে এনেছিলাম। ঠিক আপনাকে যেমন ডেকে আনলাম। মেডুসার ভয়ংকর ক্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা পাথর হয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে আমার বিশ্বাসী কাজের লোক একাদশী ও পোষা বিড়ালটা মেডুসার নজরে পড়ে পাথর হয়ে গেল। একাদশী আমাকে দেখাশোনা করত। এজন্য আমার আফশোসের সীমা নেই। একবেলা একটা কাজের লোক আমায় খাইয়ে দিয়ে যায়। মেডুসার অভিশপ্ত দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য আমি অমাবস্যার রাতে চোখে গগল্সটা লাগাই। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলে বিপদ। আপনার তো গগল্স নেই, আপনি কী করবেন?"

জীবানন্দ কোনও জবাব দিলেন না, খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন উনি। ডা: সরকার বলে চললেন, "এখন মনে করে দেখুন, বছর দুই আগে আমি যখন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলাম, তখন আপনারা আমায় পাগল সাজিয়েছিলেন এবং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছিলেন। এর প্রতিফল আপনাকে পেতে হবে।"

"আপনি ভুলে গিয়েছেন ডা: সরকার, আপনি মানসিক অসুস্থতার জন্য কিছুদিন নার্সিংহোমে ছিলেন। এখনও আপনি পুরোপুরি সুস্থ নন।"

ডা: জীবানন্দ ভৌমিক শান্তভাবে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিলেন, কিন্তু তাঁর হাত উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছিল। যদিও তিনি ভাবছিলেন, ডা: সরকার মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ এবং তিনি মেডুসার কাটা মুন্ডুর আজগুবি গল্প ফেঁদেছেন, তবু জীবানন্দের মনের ভিতরে একটা অজানা আতঙ্ক দানা বাঁধছে। তিনি ওঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না কেন, কে জানে। মনের ভাব গোপন করে তিনি ডা: সরকারকে বিদ্রুপ করে বলে উঠলেন, "কই দেখান, আপনার মেডুসার মুন্ডু।"

ডা: সরকার তেমনই ক্ষীণ স্বরে বললেন, "বারোটা বাজুক, তখনই সে বাক্সের ডালা খুলে বেরিয়ে আসবে। তার চোখের দিকে তাকালেই আপনি পাথর হয়ে যাবেন। যেমন ডা: ব্যানার্জি ও ডা: বসুর পরিণতি হয়েছে। তাঁরা তাঁদের অপরাধের উচিত শাস্তি পেয়েছেন। আপনার পরিত্রাণের কোনও আশা নেই।"

তখনই জীবানন্দ টুল থেকে ওঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। দু'টো পা শক্তিহীন। মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করছে।

ডা: সরকারের বিদ্রুপের হাসি উনি শুনতে পেলেন। "বারোটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি। মেডুসা এখনই বাক্সের ডালা খুলে বেরিয়ে আসবে। প্রতি অমাবস্যায় রাত বারোটায় ও জেগে ওঠে। ওই দেখুন, বাক্সের ডালা আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে।"

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে জীবানন্দ দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা বাক্সটার ডালা ঈষৎ খুলছে। দু'টো সাপ বাক্সের ভিতর থেকে বীভৎস মাথা বের করছে। ওদিকে বারোটা বাজতে তিরিশ সেকেন্ড বাকি। মেডুসার বাক্সটার কাছে পৌঁছতে হলে তাঁকে দু'-এক পা হাঁটতে হবে। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে জীবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। দু'টো আড়ষ্ট পা কাঁপছে থরথর করে।

ডা: সরকারের ক্ষীণ স্বর উনি শুনতে পেলেন, "আপনি দাঁড়াতে পারবেন না। কিছুই করতে পারবেন না। পালাতে পারবেন না, ডাইনির জাদু আপনাকে পালাতে দেবে না।"

মেডুসার মাথাটা বাক্স থেকে বেরোবার আগেই জীবানন্দ এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে কম্পিত হাতে বাক্সটার গায়ে জ্বলন্ত লাইটারটা ধরলেন। কাঠের জীর্ণ বাক্সটায় সহজে আগুন লেগে গেল। দাউদাউ জ্বলতে লাগল মেডুসার বাক্স। একটা অমানবিক হিংস্র আর্তনাদ শোনা গেল বাক্সটার ভিতর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ডা: জীবানন্দ ভৌমিক বললেন, "আপনার মেডুসার আর অস্তিত্ব রইল না ডা: অতীন সরকার।"

ক্ষীণ স্বরে হাহাকার করে উঠলেন ডা: সরকার, "এ কী করলেন আপনি! আমার আরও প্রতিশোধ নেওয়া বাকি ছিল।"

ঠিক সেই সময় ঘরের বড় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। পনেরো সেকেন্ড স্লো ঘড়িটা। তখনই দরজা খুলে নগেন ভিতরে ঢুকে বলল, "স্যার, প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে আপনি এসেছেন, এখন বাড়ি চলুন।"

জীবানন্দ ডাক্তারি ব্যাগ আর টর্চটা হাতে নিয়ে ডা: সরকারের দিকে না তাকিয়ে নগেনের পিছন-পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

*ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল*

# নানা রঙের সমন্বয়

## পোগো চিপ্‌স

প্রিয়া ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের সিস্টার কনসার্ন জি পি ফুড্‌স প্রাইভেট লিমিটেড সম্প্রতি বাজারে আনল পোগো পট্যাটো চিপ্‌স। পাঁচ রকম স্বাদের মনভোলানো এই চিপ্‌সগুলো থাকছে ১৭ গ্রাম, ৩৫ গ্রাম আর ১০০ গ্রামের প্যাকেটে। দাম, পাঁচ, ১০ আর ১৫ টাকা।

## ৩৬ বছরে পা দিল শিশুরঙ্গন

১৯৭০ সালে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'শিশুরঙ্গন' সংস্থা। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়েছে ৩৬টি নাটক। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে শিশুরঙ্গনের ৩৬ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হল শৈলেন ঘোষের লেখা নাটক 'ঢেউ'। তাঁরই নির্দেশনায় শিশুরঙ্গনের খুদে অভিনেতারা জমিয়ে তুলেছিল নাটকটি। সকলেই দারুণ অভিনয় করে হলভর্তি দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, যেসব ছেলেমেয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের, যারা সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে কোনও অনুষ্ঠান দেখার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায় না, তাদের জন্যে সেদিন রবীন্দ্র সদনের দরজা খোলা রেখেছিল শিশুরঙ্গন।

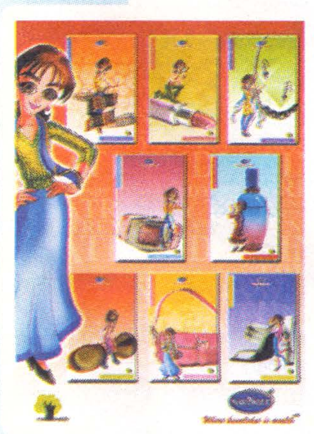


## লায়ন্স ক্লাবে 'সাইট ফর কিড্‌স'

সম্প্রতি লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-এ 'সাইট ফর কিডস' প্রোগ্রামে ৪৫ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের একটি প্রোজেক্টের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। টানা এক মাসের প্রোজেক্টটির উদ্দেশ্য, কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে এক লক্ষেরও বেশি শিশুর চোখ পরীক্ষা এবং স্ক্রিনিং করা। পরীক্ষার পর ডাক্তাররা বলে দেবেন, কী ধরনের চিকিৎসার দরকার এই শিশুদের। পরের বছরও ঠিক এইরকমভাবে চলবে এই প্রোজেক্টের কাজ।

## ফ্রিটোলের নতুন 'চিতোস'

ফ্রিটোলে কোম্পানির নতুন চিতোস এবার পাওয়া যাচ্ছে তেল ছাড়া। স্বাদ কিন্তু থাকছে একই রকম। ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এই নতুন চিতোস-এ থাকছে অনেক কম ফ্যাট। থাকছে দু' রকম প্যাকেট—৩৩ আর ১৫ গ্রামের প্যাকেটের দাম ১০ টাকা আর পাঁচ টাকা।



## ট্রেন্ডি টিনা

ছাত্রছাত্রীদের বই ও কাগজের জগতে নভনিত পাবলিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড সংক্ষেপে এন পি আই এল একটি অতি পরিচিত নাম। এই সংস্থা এবার বাজারে এনেছে ট্রেন্ডি টিনা—লং বুক সিরিজ। টিনা হল একটা কার্টুন চরিত্র। টিনা এমনই একটি মেয়ে, যে কিনা আত্মবিশ্বাসী ও সুন্দরী। সে সারা দুনিয়ার অনেক খবর রাখে। সব কিছুতে সাফল্য লাভ করার দিকে ভীষণ ঝোঁক তার। টিনার দারুণ সব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে জুয়েলারি, লিপস্টিক, বেল্ট, ব্যাগ, ঘড়ি, পারফিউম ইত্যাদি। এগুলোর ছবি আর বিভিন্ন ধরনের ডিজ়াইনের খোঁজখবর পাওয়া যাবে ট্রেন্ডি টিনার এই লং বুক সিরিজে।

## ক্যানডিকো-র কফিটফি

ক্যানডিকো-র কফিটফি এবার কফির স্বাদে টফি। তৈরি করেছে বিখ্যাত কনফেকশনারি কোম্পানি ক্যানডিকো। নতুন এই টফির নাম দেওয়া হয়েছে 'কফিটফি'। আশ্চর্য এই টফিতে রয়েছে দু' রকম স্বাদ, ক্রিম আর কফি। ভারতে এরকম টফি এই প্রথম।



# অমিল খোঁজো তফাত বোঝো





উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

# হাসছি দ্যাখো

টার্গেট প্র্যাকটিসের সময় ট্রেনি সৈন্যটি মোট পঞ্চাশবার গুলি চালানোর পর অফিসার ইন-চার্জ প্রচণ্ড রেগে তাকে বললেন, "তুমি মোট পঞ্চাশটা বুলেট খরচ করেছ, কিন্তু টার্গেটে রয়েছে মাত্র একটা বুলেটের গর্ত, ব্যাপারটা কী?"

"স্যার, প্রথম গুলিটা চালানোর গর্ত ওটা। পরের গুলিগুলোও ওই গর্তের ভিতর দিয়েই চলে গিয়েছে। আর এ-ব্যাপারে আমি একদম নিশ্চিত," বলল ট্রেনি সৈন্যটি।

বিরল প্রজাতির একটা পাখি ফাঁদ পেতে ধরার অপরাধে বনের রক্ষী গুঁইরাম দাসকে বাড়ি থেকে আটক করল পুলিশ। পরদিন আদালতে কেস উঠতে কেন সে একাজ করেছে জিজ্ঞেস করায় জজসাহেবকে গুঁইরাম বলল যে, তার স্ত্রী এবং ছেলের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্যই সে পাখিটাকে ধরতে বাধ্য হয়েছে এবং এটাই তার প্রথম পাখি শিকার। জজসাহেব বললেন, "এটা তোমার প্রথমবার, তাই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একটা কথা বলো তো, এই পাখির মাংস খেতে কেমন?"

"খুব একটা ভাল না স্যার, এর চেয়ে অনেক ভাল বক আর ডাকপাখির মাংস।"

বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে হাঙরকে মাংস খাওয়ানো দেখছিলেন সম্মোহনবিশারদ অবিনাশবাবু। পাশে দাঁড়ানো আর-একজন দর্শকের সঙ্গে সম্মোহন নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। বললেন, "শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিকেও সম্মোহন করা যায়। এই হাঙরটিকেও সম্মোহন করতে পারি আমি।"

দর্শক ভদ্রলোক বললেন, "আর যাকেই সম্মোহন করুন না কেন, একটা হাঙরকে কখনওই সম্মোহন করা সম্ভব নয়।"

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আমি এখনই হাতেনাতে তার প্রমাণ দিচ্ছি," বলে অবিনাশবাবু অ্যাকোয়ারিয়ামের জল সাঁতরে হাঙরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্মোহিত করার জন্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন প্রাণীটার চোখের দিকে। মিনিটখানেক পর তাঁকে আক্রমণ করল প্রাণীটা। রক্তাক্ত শরীরে অ্যাকোয়ারিয়ামের বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

দর্শকটি বললেন, "দেখলেন তো, কী বলেছিলাম!"

"হাঙরটা সম্মোহিত হয়েছে ঠিকই। আসলে ও এখন নিজেকে কুমির মনে করছে," যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে বললেন অবিনাশবাবু।

# অর্থ শেখো

সঠিক অর্থ না জানার ফলে অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি না। আর তাই সাহিত্য থেকে শব্দগুলো ধীরে-ধীরে বিদায় নেয়। আমাদের কথোপকথন থেকেও তারা দূরে সরে যায়। এটা ভাষার দুর্ভাগ্য, সেইসঙ্গে আমাদেরও। এরকমই বেশ কিছু শব্দ নীচে দেওয়া হল। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক বলে মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

**শৈবলিনী:** (১) শেওলা, (২) পদ্মফুল, (৩) নদী, (৪) দেবী দুর্গা।

**চরাচর:** (১) যার চলার ক্ষমতা আছে, (২) বর্ষার পর নদীর বুকে জেগে ওঠা বিশাল চর, (৩) স্বর্গ-নরক, (৪) জঙ্গম ও স্থাবর।

**গোলাপপাশ:** (১) গোলাপজল রাখার রৌপ্যপাত্রবিশেষ, (২) গোলাপফুলের সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ, (৩) গোলাপজল, (৪) গোলাপদান।

**কারুকিত :** (১) কারুকার্য, (২) কাজকর্ম, (৩) কারচুপি, (৪) চাষের জন্য জমি তৈরির কাজ।

**তালিম:** (১) তাল রাখা, (২) দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা, (৩) শিক্ষা, (৪) শিক্ষায়তন।

## গত সংখ্যার উত্তর

**ইস্তফা:** (৩) পদত্যাগ। যেমন, 'দলিল লেখার কাজে সেইদিনই ইস্তফা।' (মনোজ বসু)

**আহাম্মক:** (৪) নির্বোধ। যেমন, 'আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইতেছে।' (সুকুমার রায়)

**কালেভদ্রে:** (৩) কদাচিৎ। যেমন, 'থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়িতে কালেভদ্রে।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

**হাপুস:** (২) অশ্রুপূর্ণ। যেমন, 'ন-ঠাকরুন চুপ করে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছেন'। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

**বেঘোরে:** (১) ভীষণ নিরুপায় বা সংকটময় অবস্থায়। যেমন, 'ও পথে যেও না ভাই, মারা পড়বে বেঘোরে'। (শিবরাম চক্রবর্তী)

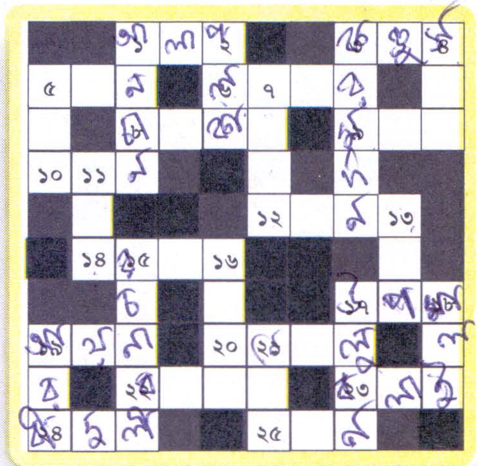
**স্কন্দগুপ্ত**

## অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) লোকটির টুপির ডিজাইনে তফাত রয়েছে। (২) টুলের একটা পায়া নেই। (৩) লোকটির প্যান্টের ডিজাইন অন্যরকম। (৪) মাটিতে আইসক্রিমের প্যাকেটটা নেই। (৫) ছেলেটির সোয়েটারের একটি বোতাম নেই।(৬) লোকটির ডান হাতের আঙুল কাপের হ্যান্ডেলের ভিতর ঢোকানো। (৭) ডান দিকের পরদা দেওয়ালের আড়ালে। (৮) দেওয়ালের ছবির গোঁফ অন্যরকম।

## সংকেত: পাশাপাশি

(১) কথাবার্তা, পরিচয়। (৩) কৃপণ, পয়সা খরচ করতে চায় না এমন। (৫) কথা, উক্তি। (৬) পদাতিক সৈন্য, জাহাজের খালাসি। (৮) খোশামুদে। (৯) মিষ্টি স্বাদ আছে যার। (১০) করহ যতন, লাভ হইবে—। (১২) ওলটপালট, বিধ্বস্ত। (১৪) প্রাচীনকালের যে যজ্ঞে মানুষ বলি দেওয়া হত। (১৮) আসল মালিকের বদলে অন্য লোকের নাম ব্যবহার করা হয়েছে এমন। (১৯) মুকুর, আরশি, দর্পণ। (২০) মনের মিল, সদ্ভাব। (২২) যে লতা অরণ্যে অযত্নে বড় হয়। (২৩) বলরামের ডাকনাম। (২৪) বিদ্যুৎ। (২৫) ধর্মবিশ্বাস, বিবেক।



## সংকেত: উপর-নীচ

(১) আকুল, 'মা বলিতে প্রাণ করে —।' (২) একটুতেই ভেঙে যায় এমন। (৩) শুভেচ্ছা জানাবার জন্য পরস্পরের হাতের পাঞ্জা ধরে ঝাঁকুনি। (৪) বাতাস। (৫) অসভ্য। (৭) এই ঠান্ডা পানীয় শরীরকে শীতল করে। (১১) দিবাকর। (১৩) শঠতা, প্রতারণা। (১৫) রচনাসমগ্র। (১৬) টাকার জোর। (১৭) ঘাসজাতীয় গাছের ঝোপ, সেখানে মুক্তো ছড়ানো নির্বুদ্ধিতা। (১৮) দুধের সর, — বরফ। (১৯) আরবদেশের ভাষা, যা বহু বাংলা শব্দে ঠাঁই করে নিয়েছে। (২১) নিমাই সন্ন্যাসীর সঙ্গী নিত্যানন্দ।

**দেবসেনাপতি**

## গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | জ | বা | ব | | | দ | র্দু | র |
| আ | স | ল | | স | হ | কা | র | | স |
| রা | | ম | ন্ব | ন্ত | র | | দ | র | দ |
| ম | ল | য় | | | দ | | স্তু | | |
| | লা | | | | ম | হ | র | ম | |
| | ট | ল | ম | ল | | | | ঙ্গ | |
| | | ব | | ক্ষ্মী | | | ক | ল | ম |
| রা | ব | ণ | | বা | র | বে | লা | | হ |
| স | | জ | হ | র | ত | | ধ | ক | ল |
| ভ | য়া | ল | | | ন | গ | র | | |

**সেখানে নাম না-জানা গাছ আর রংবেরঙের পাখির মেলা। অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য আর খাড়া পাহাড় হাতছানি দেয় পর্যটকদের। লিখেছেন** অর্পিতা দাশ

# পাখিপাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার

ডিসেম্বরের শেষ মানেই শীত, তারপর জমিয়ে ঠান্ডা। আর শীত মানেই তো আমাদের ক্যাম্প। সবাই একসঙ্গে শুধুই আনন্দ আর মজা। এই সময় আমরা পাইকপাড়া ট্রেকার্স গিল্ড-এর পুরনো ও নতুন বন্ধুরা এবং আরও কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, পুরুলিয়ার পাখিপাহাড় অভিযান।

পরদিন সকালে পৌঁছলাম ভুচগুী। ২৬ জন ছিলাম আমরা। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ল সেই পাহাড়; গ্রাম্য, শান্ত পরিবেশে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে রুকস্যাক নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমরা। চারদিক চুপচাপ, নিস্তব্ধ। এক সময় বড় রাস্তা ছেড়ে বনের ভিতর ঢুকলাম। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে পাহাড়টা। কাছে যখন পৌঁছলাম, চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে বিশাল বড়-বড় সব পাখি আঁকা। গ্রামের লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, পাহাড়টা দেখতে অনেকটা মানুষের টাকপড়া মাথার মতো, তাই গ্রামের লোকরা একে ডাকত 'মুরহাবুড়ু' নামে। পরে, বাঙালি চিত্রকর চিত্ত দে এই পাহাড়ের গায়ে সাদা রং দিয়ে বেশ কয়েকটা পাখি আঁকেন। এই ছবিগুলো এতই বড় যে, দূর থেকে দেখলে মনে হয়, অনেক পাখি উড়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। তাই এর নাম এখন পাখিপাহাড়।



ফেরার পথে

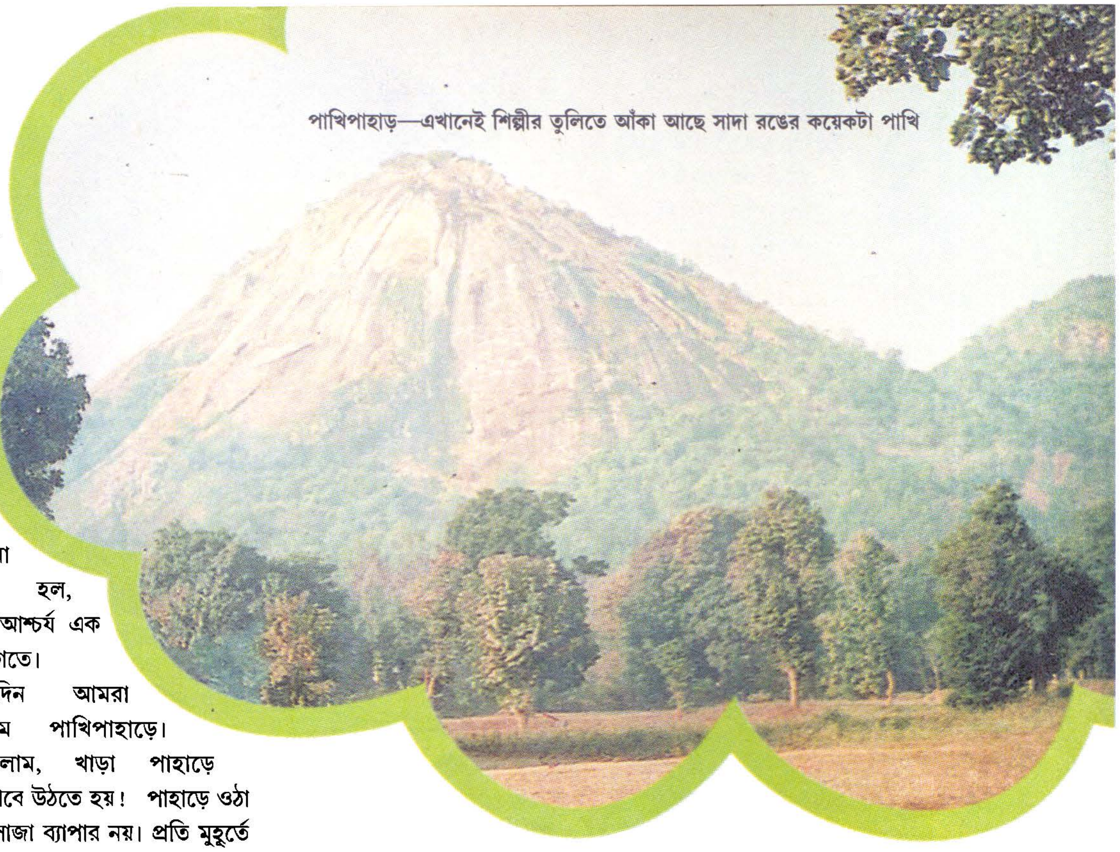


পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় পা ফেলতে হয় সাবধানে

এই অরণ্য তৈরি করেছে স্থানীয় মানুষ। প্রকৃতি বাঁচাতে গ্রামের লোকজন প্রচুর পরিমাণে শাল, সেগুন ইত্যাদি গাছ রোপণ করেছিল। ভালবাসা আর দরদ দিয়ে বড় করে তুলেছিল সেসব গাছ। তারপর গাছগুলো ধীরে-ধীরে তৈরি করে ফেলেছে ঘন অরণ্য। আজ এই জঙ্গল গ্রামের মানুষদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

আমরা তাঁবুতে পৌঁছলাম হেঁটে। আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই কিছুটা ভিজে ছিল চারপাশ। চারদিকে আশ্চর্য এক নিস্তব্ধতা। লম্বা-লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে মাটিতে। হাল্‌কা বাতাসে আমাদের ক্যাম্পের ছোট্ট হলুদ পতাকা দুলছে। আকাশ ছুঁয়েছে ইউক্যালিপটাস গাছগুলো। শুনলাম, এই জঙ্গলে নাকি





পাখিপাহাড়—এখানেই শিল্পীর তুলিতে আঁকা আছে সাদা রঙের কয়েকটা পাখি

হাতি আছে।

গ্রামবাসীদের প্রিয় সেই অরণ্য দেখতে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম সকলে। সেখানে পৌঁছে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অপূর্ব। প্রকৃতি পড়ুয়ার মতো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম অরণ্যের সৌন্দর্য। কান পেতে শুনতে লাগলাম গাছের ফিসফিসানি।



অনেক অজানা গাছ, নাম না-জানা পাখি—মনে হল, চলে এসেছি আশ্চর্য এক রূপকথার জগতে।

পরদিন আমরা গেলাম পাখিপাহাড়ে। শিখলাম, খাড়া পাহাড়ে কীভাবে উঠতে হয়! পাহাড়ে ওঠা খুব সোজা ব্যাপার নয়। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। তাই প্রচণ্ড খাড়া ওই পাহাড়ে উঠতে হলে পা ফেলতে হয় সাবধানে, না হলে পা পিছলে যায়। পাহাড় থেকে যতদূর চোখ যায়, সবুজ আর সবুজ। মাঝে-মাঝে শুকনো পাতা, তাতে হলুদ রং।

ধীরে-ধীরে রাত নামল। খুব মায়াবী লাগছিল চারদিক। মাথার উপর পরিষ্কার আকাশ। খুব বড় লাগছিল জ্যোৎস্নামাখা চাঁদটাকে। তারায় ভর্তি আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কাটিয়ে দেওয়া যায় সারারাত। কোন তারার কী নাম? চিনে ফেললাম বেশ কিছু তারা। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি হল এক পশলা। ঠান্ডাও পড়ল খুব।

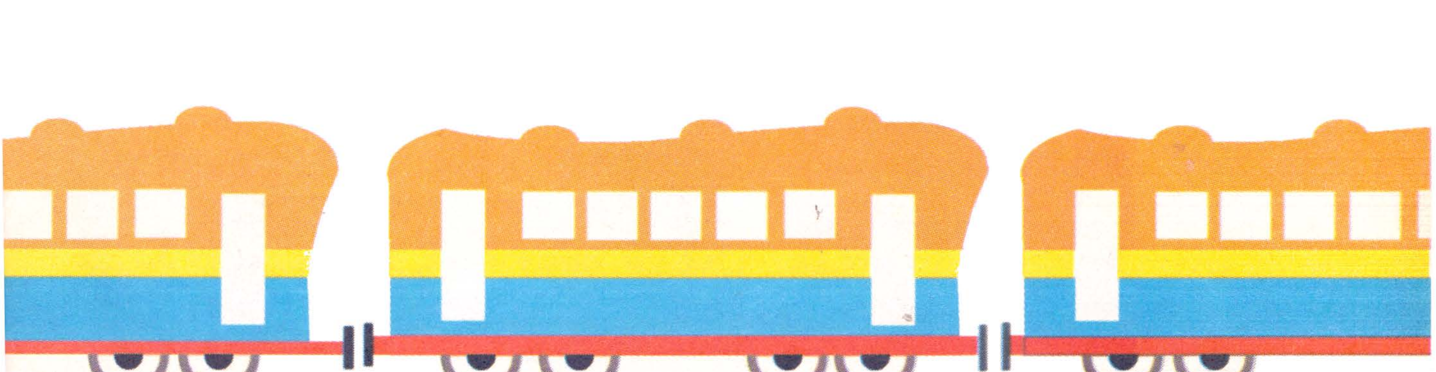
পাখিপাহাড় টানছিল আমাদের। পরের দিন ঠিক হল আবার যাওয়া হবে পাখিপাহাড়। ওই জায়গার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারছিলাম না আমরা কেউই। এবার পাহাড়ে ওঠার সময় দড়ির সাহায্য নিলাম। কারণ, এটা অনেক বেশি নিরাপদ। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হল। পাতা দিয়ে তৈরি পিঁপড়ের বাসা দেখলাম।

রাতে কিন্তু ঘুমিয়ে থাকে না সকলে। ক্যাম্পে, দলের সিনিয়র মেম্বারদের রাতে পাহারা দিতে হয়। বাকিরা ঘুমোয়। যারা জেগে থাকে তারা ভাগ্যবান। কারণ, রাতের প্রকৃতি মায়াবী। পূর্ণিমার চাঁদের উছলে পড়া আলোয় স্নান করছে গোটা অরণ্য। এই মায়াবী প্রকৃতিকে দু'চোখ ভরে দেখার বিরল অভিজ্ঞতা হয় শুধুমাত্র ক্যাম্পের সিনিয়র মেম্বারদেরই। নিস্তব্ধ পরিবেশ মোহময় করে তুলেছে চারপাশ। অসাধারণ এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কীভাবে যে সময় কেটে যায়, টের পাওয়া যায় না।

সকাল হল। আমরা এগিয়ে চললাম পাখিপাহাড়ের দিকে। বিপদসঙ্কুল পথ। অনেকটা হাঁটার পর এবার বিশ্রাম। নিজেরা পাথর দিয়ে উনুন তৈরি করে রান্না করলাম। সেদিনটা ছিল ক্যাম্প ফায়ারের দিন। কাঠ আর খড়ের আগুনের ধোঁয়া উঠছে আকাশে। আমরা সবাই গোল হয়ে বসে আছি। রয়েছেন কয়েকজন গ্রামবাসীও। আমরা গান গাইছি।

পরদিন বিকেলে বাস। এবার ফেরার পালা। তাঁবু গুটিয়ে নিলাম। ধীরে-ধীরে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ফিরে চললাম বাড়ির পথে, কিন্তু মন পড়ে রইল পাখিপাহাড়ের প্রকৃতির কোলে।

*ফোটো: লেখিকা*





# জন্মান্তর

## অনন্ত সিংহ

মোল গাছের তলায় বসে ছ' বছরের মা-মরা পারুল সাজিমাটি খেলছে। বাবা ডাকল, "পারু...।"

"যাই বাবা...।"

ছুটে এসে, দুয়োরে বাঁশের সাঙা থেকে টেপজামাটা গলিয়ে নিয়ে বাবার হাত ধরে পারুল।

বাবা-মেয়ে চলেছে চাঁচরের মেলা দেখতে। মাঠের আলপথ ধরে আগুপিছু করে দু'জনে হাঁটছে।

"বাবা, কোথাকে যাবে?"

"তাতালপুর।"

"সেটি কোথা?"

"হাই ধুরের তালগাছগুলো দেখচু, তার ওধারে কয়াপাটের মাঠ। সেটি পেরিই উঠব মরাগেড়ের খালে। খালপাড় থিকে নাক বরাবর গেলে পরে পাকা রাস্তা পাব। পাকা রাস্তা ধরে খানিক গেলেই তাতালপুর, গুরুদেবের আশ্যম। সুয্যি ডোবার আগে বেলাবেলি পৌঁছতে হবে। একটু হপর-হপর চ...।"

পারুল বাবার সঙ্গে হেঁটে পারে না। তাকে ছুটতে হচ্ছে।

•





"বাবা, পাকা রাস্তায় বাস গাড়ি চলেনি?"

"হ্যাঁ চলে।"

"ওই গাড়িতে চাপব আমরা?"

"আগে চ তো, সে এখনও কোশ পাঁচেক ধুর।"

দেখতে-দেখতে তারা সাঁওতাল পাড়ায় ঢুকে পড়ে। হাপনের মা, ঘাটে পোড়া মাজছে।

"ও বুড়ি, বাপের সঙ্গে কুথাকে যাবি?"

"তাতালপুর, চাঁচর দেখতে।"

"হাই বাপ! সে হেথা কুথা, অনৌক ধুর তো।" পারুল জানে না কতদূর। সে শুধু মায়ের বয়সি মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"ও বুড়ির বাপা, এই দুধের শিশুকে লিয়ে কুথাকে যাচ্ছ?"

"চাঁচর দেখতে গো। হপনের বাপ আছে ঘরকে?"

"না, গম কাটতে গ্যাচে। তুমি উয়ারে হেথাকে রেখে যাও। উ অদধুর যেতে লারবে। আয় বুড়ি বাখুলদিগে। ছাগলদুধ দুবো, গাছে পাকা পিঁফে আচে... গোরু-ছাগল চরাবি...।"

"না, আমি বাবার সঙ্গে যাব।"

"তুমি উয়ারে আগাম কাঁধে লাও তো, বুড়ির বাপ।"

চালের বস্তা, ধানের বোঝাবওয়া চওড়া কাঁধে পারুল চাপে।

কয়াপাটের বিশাল ফাঁকা মাঠে ওরা এসে পড়ে।

"বাবা, চাঁচরে কী হয়?"

"বাজি ফুটবে, বোম ফুটবে। বাজনা বাজবে, পুজো হবে।"

"তারাবাজি ফুটবে?"

"হ্যাঁ, মেলা বাজি ফুটবে। কত আলো দেখবি, লাল, লীল, সবজে, হলদে।"

"মেলা বসবেনি?"

"হ্যাঁ, বিরাট মেলা হবে।"

"বাবা, আমায় তেলেভাজা কিনে দিবে?"

"হ্যাঁ রে, দুবো।"

"আর কাচের চুড়ি?"

"দুবো।"

কয়াপাটের মাঠ যেন শেষ-ই হতে চায় না। ধু-ধু, রুক্ষ ধানজমি। দূরে, আবছা খালের উঁচু পাড় দেখা যাচ্ছে। বাবার কাঁধে চেপে কচি মেয়েটা রোদে পুড়ে ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছে। তবু তার কোনও কষ্ট নেই। মনে টগবগে ফুর্তি। বাবা তেলেভাজা কিনে দেবে। কাচের চুড়ি দেবে।

হাঁটুর উপর কাপড় তুলে গেঞ্জি-জামা গায়ে খাঁদা বাগদি মা-মরা মেয়েকে একবার এ-কাঁধে আর-একবার ও-কাঁধে করে চলেছে। প্রায় ক্রোশখানেক পথ হেঁটে তারা খালপাড়ে পৌঁছে যায়। বটগাছের তলায় এসে জিরিয়ে নেয়।

"বাবা, পিয়েস পেইচে।"

"থাম, একটুক জিরিয়ে লে।"

সেই ফাঁকে খালপাড়ের বড়তলায় মিষ্টি হাওয়ায়, বড়পাতার ঠোকাঠুকির শব্দে, কোকিলের ডাকে পারুল এক অদ্ভুত অজানা, অচেনা জগৎ দেখতে পায়। আনমনে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে মেছোবক, ঘাসফড়িং, পদ্মপাতা, কাচপানা জলে হাল্কা ঢেউ দেখেই যায়। পৃথিবীটা এত বড়, সে আগে জানত না। এই বিশাল মাঠের ওপারে কোথায় তাদের ঘর? মাঠের সেপাশে তো, 'আগাশটা লেবে গ্যাচে, সেথায় ঘর কী করে হবে?'

"বাবা, আমাদে ঘর কোথাকে?"

"সে অনৌক ধুর। এখেন থিকে বুইতে পারবিনি।"

আমাদে ঘর অনৌক ধুর, বাবা কী বলচে!

"কত ধুর বাবা, কোন পানে?"

"হাই সেপাশে, ঈষেন কোণ বরাবর।" বাবা হাত বাড়িয়ে দেখায়। সে দেখে। দূরে, বহু দূরে, তালগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে, তার-ও সেপাশে তাদের ঘর। সে তেষ্টা ভুলে যায়। ঘরে ফেরার টান অনুভব করে।

"বাবা, ঘর চলো।"

"ঘর কি যাবি রে?"

"না, তুমি ঘর চলো।"

"ধুর পাগলি, চাঁচর দেখবিনি, মেলা আলো, বাজি, লোকজন, হইরই কাণ্ড, কত আনন্দ হবে...।"

"কবে ফিরবে?"

"কাল ভোর-ভোর ফিরে পড়ব। চ, জল খাবি যে।"

দু'জনে জলে নামে। গোড়ালি ডোবে। হাত দিয়ে নোংরা সরিয়ে খালের পরিষ্কার স্বচ্ছ জল আঁজলা করে মেয়েকে খাওয়ায়। পেটপুরে নিজে খায়। গাছতলায় এসে গামছায় বাঁধা মুড়ি খোলে। শুকনো মুড়ি দু'জনে চিবোয়।

একটা সরষে বোঝাই গোরুর গাড়ি খালের ওদিক থেকে ফিরছে। গাড়োয়ান কাছে এসে বলে, "আরে! খাঁদাদা যে! তা কদ্দুর?"

"যাব, হাই তাতালপুর।"

"চাঁচর দেখতে?"

"হ্যাঁ।"

"তা, তোমাদে সেপাশে আলু কেমন হইচে?"

"মোটামুটি ভালই।"

"ইদিকে সব শেষ হয়ে গ্যাল...।"

"কেন?"

"বিস্তর শিল পড়েচে গো। পাথর জমিতে তো লয়, যেন বুকে পড়েচে, দাদা... বুকটা ভেঙে চৌচির হয়ে গ্যাচে।"

পারুল অবাক হয়ে দ্যাখে, বাবার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে লোকটা কাঁদছে। এ-বাবা, এত বড় লোকেও কাঁদে নাকি? সে ভয় পায়। গাছের আড়ালে গিয়ে উঁকি মেরে লোকটাকে দ্যাখে।

"এই যে সরষের গাদা, কী আছে এতে?"

"মেরি লেগে সব শেষ করে দিইচে। শুধু কাঠি ক'খানা ঘরকে লিয়ে যাচ্ছি। সারাবছর তেলটাও কিনে খেতে হবে। ভেবেছিলাম, আলুর টাকায় ই-বছর একটা মেয়েকে পার করাব... সেসব তো চুলোয় গেল, ছেলেপুলে লিয়ে সমবচ্ছর চলবে কী করে তার ঠিক নাই। তুমি শুকনো মুড়ি চিবুচ্ছ কেনে? আগুতে যাও, রতিদার ছেলে মাঠে আছে, চারটি শুঁটি ছিঁড়ে লাও গে। মাঠে শাঁকালুও তো রইচে, মেয়েকে তুলে দাও, খাবে...।"

গোরুগুলো আর দাঁড়াতে চাইছে না। নড়ানড়ি করছে।

"চলি দাদা, সময় করে একবার বাখুলদিগে যেও।"

"হ্যাঁ, যাব।"

বাবা-মেয়েতে আবার চলতে শুরু করে।

"বাবা, লোকটা কাঁদছিল কেনে?"

"শিল পড়েচে জমিতে। আলু সব লষ্ট হয়ে গ্যাচে।"

"শিল তো হেঁসেলে থাকে, জমিতে কী করে এল?"

"না, না সেই শিল লয়, আগাশের শিল, পাথর।"

পারুল অবাক হয়ে আকাশের দিকে

তাকায়। এত বড় আকাশের কোথায় শিল আছে, চোখ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না।

"বাবা, আগাশের কোথাকে শিল আছে?"

"আছে, আছে, তুই চ তো।"

পারুলের মন ভরে না। যেতে-যেতে বারবার উপরের দিকে তাকায়। সেখানে ছোট-ছোট সাদাপারা মেঘ দাঁড়িয়ে আছে। বাকি জায়গাটা ফ্যাকাসে নীল বর্ণের। সে ভাবতে থাকে, 'যদি আমাদে সামনে একটা শিলপাথর আগাশ থেকে এখন পড়ত।'

"চ পারু, একটু পা চালিয়ে আগা, এখনও মেলা পথ বাকি।"

এত গরমেও কে যেন গান ধরেছে...

"চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেচে

আমরা ভেবে করব কী..."

পারুল গান শোনে। কাছে এসে দ্যাখে, একটা লোক পাকা গম কাটছে। পাশে, জমিতে মটরশুঁটি ফলে আছে। লোকটা গান থামায়।

"কাকা যে, কদ্দুর?"

"যাব, হাই চাঁচর দেখতে।"

"তাতালপুর?"

"আজ্ঞে।"

"বাবা, শুঁটি!"

লোকটা হেসে বলে, "লাও, শুঁটি তুলো, যত খুশি লাও।"

দৌড়ে জমিতে নেমে পড়ে পারুল। দু'হাত ভর্তি করে মটরশুঁটি তোলে। গমকাটা লোকটা বলে, "শাঁকালু খাবে?"

"হ্যাঁ।"

জমির মাটি সরিয়ে-সরিয়ে ভিতর থেকে শাঁকালু বের করে।

"খালে ধুয়ে লিয়ে খাবে। তা কাকা, খপর কী?"

"কী আর খপর, বাপ কেমন আছে?"

"এখন তো শয্যা লিয়েছে, হাঁপানির টান ওঠে। কাজ-কাম আর তেমন পারে না। তুমি এখন কাদে ঘরে আচ?

"পরেশ পতিহারের ঘরে।"

"বাঁধা না লগদা?"

"ই-বছর বাঁধাই আচি।"

"সামনে বার ইদিকপানে আসবেনি?"

"সেরমই তো ইচ্চে ছিল।"

"দেখব, তবে বাঁধাবুঁধি আর থাকবনি।"

"লগদাই করবে গো। এসো কিন্তু, ভুলোনি।"

"ঠিক আচে, আগাচ্চি।"

"আর চারটি শুঁটি লাও, চিবুতে-চিবুতে যাবে...!" দশ-বারোটা গাছ উপড়ে হাতে দেয়।

তারা আবার চলতে থাকে। খালের উঁচু পাড়ই এখানকার যোগাযোগের রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে দাঁত দিয়ে শাঁকালু ছাড়াতে-ছাড়াতে ছোট্ট পারুল বাবার কাঁধে চেপে চলেছে। মাঝে একবার নেমে দু'জনে খালের জল খায়। গাছের তলায় বসে। মুড়ি খায়। চান করে। আবার এগোয়।

এখন মাঠটা একদম ফাঁকা। শুধু বুক চিরে খালটা সামনে এগিয়ে গিয়েছে। খালে জলও তেমন নেই। শুধু ঢোল কলমির ঝাড় হাওয়ায় দুলছে। তাতে মাছরাঙা বসে আছে। ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ টুনটুনি উড়ছে।

আরও অনেক দূর যাওয়ার পর তারা দ্যাখে আমবাগান, বাঁশবাগান। বাঁশবন পেরিয়ে গ্রাম। সেখানে সব খড়ের ছাওয়া মাটির ঘর। দু'-একটা টিন অ্যাসবেসটসের কোঠাবাড়ি। খামারে খড়ের পালুই। সরষের গাদা। তারা গ্রামের ভিতর ঢোকে। সেখানে ডুগডুগি বাজিয়ে আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে। বাচ্চারা, আর-দু'-একটা ঘোমটা দেওয়া কমবয়সি বউ ঘিরে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম কিনছে। পারুল দ্যাখে, সকলে কেমন বরফ খাচ্ছে। সে বাবাকে বলতে পারে না। বাবা তো মেলা থেকে চুড়ি কিনে দেবে। তেলেভাজা দেবে। তবু ভাবে, যদি কিনে দেয়। দিল না।

তারা গ্রাম ছাড়িয়ে, তেঁতুলগাছ পেরিয়ে আবার মাঠে নামে। এই মাঠ আর খাঁ-খাঁ রোদে ভাজা-ভাজা হয়ে যাওয়া জমি নয়। সবুজে-সবুজে ভরা খেত। পটল, ঝিঙে, কুমড়োর খেত, এ-পাশে ও-পাশে। পারুল আগে এমন গাছ দেখেনি। সরু-সরু লম্বা-লম্বা গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। যেতে-যেতে গায়ে ঠেকছে। তার খুব ভাল লাগছে। উঁচু-উঁচু গাছের মাঝে পড়ে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু মাথা তুললে নীল আকাশ হাতছানি দেয়।

"গাছের গায়ে অত হাত দিচ্চিস কেনে?"

"কী হবে?"

"সাপখোপ কোথা কী আছে!"

সে ভয় পায়। পিছন থেকে গেঞ্জি টেনে ধরে। দূরে, আবছামতো কী একটা সরে-সরে যাচ্ছে।

"হাই দ্যাখ, বাসগাড়ি!"

"কই বাবা, আমি দেখব!"

বাস তখন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

এবার সত্যি-সত্যি পরিষ্কার চোখে লাগে বাসগাড়ি।

"বাবা, হাই দ্যাখো, বাসগাড়ি যাচ্চে।"

"চ, লপর-লপর, বাসে চাপবি যে।"

পারুল আর পারছে না। সে খুব ক্লান্ত। বাবা আবার কাঁধে তুলে নেয়। বাসগাড়ি দেখার পর থেকে তার আর কোনওদিকে চোখ যায় না। শুধু বাসের দিকেই মন পড়ে থাকে।

"বাবা, বাসগাড়ি আর আসচেনি কেনে?"

"আসবে, টাইম হয়নি।"

"টাইম কখুন হবে?"

"হবে, আমরা যাই।"

গ্রামের মধ্য দিয়ে একটা সরু মাটির রাস্তা ধরে তারা এগোয়। এখন আর খালটা দেখা যাচ্ছে না। কোনওদিকে বাঁক নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

সূর্য যখন পশ্চিমে একটু হেলে পড়েছে তারা পাকা রাস্তায় এসে পড়ে। পারুল জীবনে এত বড় কালো রঙের পাকা রাস্তা আগে দেখেনি। কালো মোষের মতো পড়ে থাকা চওড়া রাস্তার এদিকওদিক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

"বাবা, এই কুলিটা কালোপারা কেনে?"

"এ কুলি লয়, পাকা রাস্তা। বাস চলে।"

"রাস্তা পাকা হলেই কালো কেনে হবে? আমাদে গেরামে পাকা রাস্তা নাই কেনে," নিজের পায়ের দিকে দ্যাখে, মেটে ধুলোয় হাঁটু পর্যন্ত কেমন হয়ে গিয়েছে। 'পাকা রাস্তায় তো ধুলো নাই, মাটি নাই, ঘাসও নাই। এ কেমনপারা রাস্তা? কোথায় গ্যাচে? কেন গ্যাচে? কোত্থেকে এইচে?' সে মন-প্রাণ দিয়ে ভেবেই চলে। সবটাই তার কাছে এক রহস্য। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

"বাবা, বাসগাড়ি কখুন আসবে?"

"একটু পরে আসবে।"

"বাসে চেপে আমরা যাব?"

"হ্যাঁ।"

"কোথাকে যাব?"

"তাতালপুর।"

"সে কোথাকে?" তাতালপুর নামটাই তার মনে শিহরণ জাগায়। একটা স্বপ্নের দেশ মনে হয়, "কতখনে সেখেনকে যাব...?"

"হাই দ্যাখ, বাস আসচে।"

পারুল চমকে উঠে দ্যাখে, গাঁক-গাঁক করে ছুটে আসছে বড় মতো বাসগাড়ি। কী বিকট শব্দ করছে। ভুস করে সামনে এসে দাঁড়াল।

"লে, উঠ।"

রাস্তা থেকে সিঁড়ি অনেক উঁচুতে। বাবা ধরে তুলে দেয়।

"যা, সিটে বস গিয়ে।"

সে বসতে ভয় পায়। লজ্জা করে। মোটা রডটা ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা বসলে পরে কোলে বসে।

এখন আর হাঁটতে হচ্ছে না। অথচ শাঁইশাঁই করে সব কিছু ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। বাঃ, বেশ মজা তো! মনের আনন্দে বাইরেটা দ্যাখে। কেমন যেন লাগছে। ভয়ও পাচ্ছে। বাবাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

মনে হচ্ছে, সে যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের গ্রাম, মোলতলা, সাঁওতালপাড়া, খালধার সব কোথায় চলে যাচ্ছে। সে শুধু ছুটছে। এক মায়াময় অপূর্ব অনুভূতি সারা শরীর-মন জুড়ে খেলা করে বেড়ায়। যেন এক রূপকথার রাজত্বে সে ঢুকে পড়েছে। চেনাজানা, স্থির, শান্ত জীবনের বাইরে এক অজানা গতিশীল জগতের সন্ধান পায়। জীবনকে নতুন করে চিনতে শেখে। তার যেন আজ নতুন জন্ম হচ্ছে।

"তাতালপুর!" কন্ডাকটরের হেঁড়ে গলার চিৎকারে বাবা সিট ছাড়ে। দু'জনে ঝপাঝপ বাস থেকে নামে। বাস আবার হুশ করে চলে যায়। পারুল কিছুক্ষণ চলমান গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন আস্তে-আস্তে গাড়িটা তার চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে।

"বাবা, বাসগাড়ি কোথাকে যাবে?"

"ঘাটাল।"

"সে কোথা?"

"অনৌক ধুর।"

কত দূর! তার চেনাজানা জগতের বাইরে কোথাও। পৃথিবীটা কত বড়... সে ভেবে কূল পায় না। 'ঘাটাল কেমন দেশ? সেথা মোল, বাবলা, খেজুর, তালগাছ আছে? ধান জমি, মেঠো কুলি? সেথা কারা থাকে, কেমনপারা তাদের ঢং, কথাবার্তা?' হাজারও প্রশ্ন আসে তার মনে। "বাবা, আমি ঘাটাল যাব।"

"ধুর। চাঁচরের মেলা দেখবিনি?"

"না। বাসে চেপে আরও ধুর কোথাও যাব। চলো না আমাকে লিয়ে।"

"বোকা মেয়ে। মেলা দেখবিনি? কত বাজি ফুটবে, চোপোরাত গান হবে। কত কী বেচাকেনা হবে। চুড়ি কিনবিনি?"

বাবার কথাগুলো তার কানেই পৌঁছয় না। সে তাকিয়েই থাকে দূরে, মোষের মতো পড়ে থাকা পাকা রাস্তার দিকে। ক্রমশ আবছা হয়ে মিলিয়ে যাওয়া বাসগাড়িটার দিকে।

এখন পারুলের কোনও খিদে নেই। বায়নাও নেই। কাচের চুড়ি পরার শখও উধাও। ছোট্ট মেয়েটার কী যে হল বাবা নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না!

*ছবি: কৌশিক কুণ্ডু*

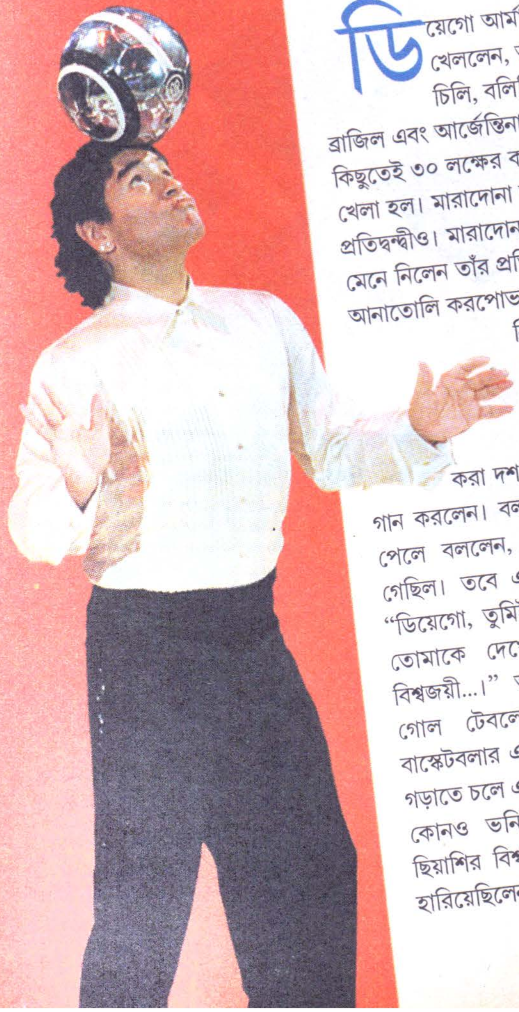
ফুটবল ছেড়েছেন। দাবা খেলে, টিভি প্রোগ্রামের হোস্ট হিসেবে নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন মারাদোনা। জানাচ্ছেন

সন্দীপ দাশগুপ্ত



টেলিভিশন শো 'লা নেচে ডেল তেন'-এ মেয়ে জিয়ানিন্না (বাঁ দিকে প্রথম) এবং এক ব্রাজিলিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে মারাদোনা

# টেলিভিশনে মারাদোনা



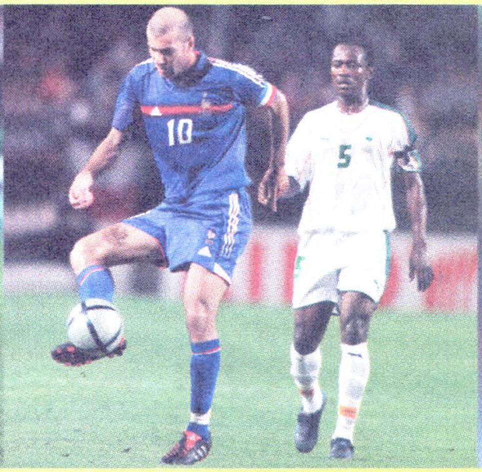
ডিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা দাবা খেললেন, আর দেখল উরুগুয়ে, পেরু, চিলি, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং আর্জেন্তিনার মানুষ। মোট দর্শক? কিছুতেই ৩০ লক্ষের কম নয়। ঠিক চার চালের খেলা হল। মারাদোনা দু'বার চাল দিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীও। মারাদোনাই ড্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেনে নিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম? আনাতোলি করপোভ।

নিন্দুকেরা বলেন, মারাদোনাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারেন না পেলে। কিন্তু দেখা গেল দু'জনে দু'জনকে আলিঙ্গন করছেন। সই করা দশ নম্বর জার্সি বিনিময় হল। দু'জনে গান করলেন। বল নিয়ে মাথায় মাথায় খেলা হল। পেলে বললেন, তাঁর ছেলেটা নেশা করে বখে গেছিল। তবে একদিন সে নতুন জীবনে ফিরবে, "ডিয়েগো, তুমিই ওর প্রেরণা। নেশা ছাড়ার শক্তি তোমাকে দেখেই অর্জন করছে। কারণ তুমি বিশ্বজয়ী...।" আড্ডা মারছেন মারাদোনা। একটা গোল টেবলের উল্টোদিকে বসে আড্ডাসঙ্গী বাস্কেটবলার এমানুয়েল জিনোবিলি। আড্ডা গড়াতে গড়াতে চলে এল এক অপ্রত্যাশিত মোড়ে। এই প্রথম কোনও ভনিতা না করেই মারাদোনা বলছেন, ছিয়াশির বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন আসলে বাঁ হাতে। হেডে নয়, গোল করেছিলেন হাত দিয়ে, অর্থাৎ ওই গোলের পিছনে ঐশ্বরিক কোনও লীলা ছিল বলছেন না। সরাসরি জানাচ্ছেন, ঈশ্বর আসলে তিনি স্বয়ং। এবং ওই গোলটা পরিষ্কার চুরি করেছিলেন। এ ভাবেই প্রতিটি আড্ডা, একেবারে অন্য এক মানুষকে দেখছে। শুধু নির্মেদ মারাদোনা নয়। তিনি গুয়াতেমালার পপ-তারা আরাজোনার সান্নিধ্যে মশগুল। কখনও তাঁর পাশে অনিন্দ্য-সুন্দরী ইতালীয় অভিনেত্রী। ফুটবল কিংবদন্তী স্বীকার করছেন মারিয়া কুসিনোত্তার অভিনয়ে তিনি কতটা সম্মোহিত। সুপার মডেলরাও যোগ দিচ্ছেন।

দক্ষিণ আমেরিকা পাগল করা এক-একটা পপ অ্যালবাম বাজছে। মারাদোনা নাচছেন। তাঁর হাতে কখনও সাবাতিনির র‍্যাকেট। কখনও শো-ম্যানদের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে গড়িয়ে পড়ছেন। এক মৃতপ্রায় টিভি চ্যানেলকে টেনে তুলছেন, সপ্তাহে একদিন পাক্কা দু'ঘন্টার শো 'লা নোচে দেল তেন' বা দশ নম্বরের রাত। ডিয়েগোর জার্সির নম্বর দিয়ে টক শো-র নামকরণ। কিন্তু জনপ্রিয়তায় এক নম্বর। মারাদোনা বলছেন, মেয়ে ডালমার কথা। 'গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি' থেকে ফিরছেন। আনন্দে-উত্তেজনায় কাঁপছেন। ডালমার জন্য। ডালমাই মারাদোনা পরিবারের প্রথম স্নাতক। আমরাও উত্তেজিত। এ হেন শো দেখতে পাচ্ছি না বলে। আশায় আছি, ভারতীয় কোনও চ্যানেল একদিন দেখানো শুরু করবেই 'দশ নম্বরের রাত'। হলেও বা স্প্যানিশ ভাষার অনুষ্ঠান। ডাবিং করে নিতে কতক্ষণ!

অবসর ভেঙে ফিরে একাই ফ্রান্সকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তুললেন জ়িনেদিন জ়িদান। লিখেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়







# 'জাদুকর' জ়িদান

কিক অফ

না চাইলেও তুলনাগুলো চলে আসে! পেলে বড় না গ্যারিঞ্চা? এই প্রশ্ন ছ'য়ের দশকে তুমুল আলোড়ন তুলত। ভেসে বেড়াত ববি মুর বা ববি চার্লটনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন। শুধু সমসাময়িকদের মধ্যে নয়, এই ধরনের 'লড়াই' চলে দু' প্রজন্মের 'সেরা'দের মধ্যেও। ঠিক লড়াই নয়, বিতর্ক! এবং বেশিরভাগ সময়ই সেটা সংবাদমাধ্যমের বাঁধানো, সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীদের কল্পনাপ্রসূত। হাজারটা যুক্তি, চুলচেরা বিশ্লেষণ। লক্ষ্য একটাই, কে কার চেয়ে এগিয়ে, সেটা ফুটবলমনস্কের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া। ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জেতার দু'বছরের মধ্যে ফ্রান্স যখন ইউরোপ সেরা হল, তখন অবধারিতভাবে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন বিতর্কের। ফরাসি ফুটবলের দু'জন শিল্পী, মিশেল প্লাতিনি এবং জ়িনেদিন জ়িদানের মধ্যে কে সেরা? তবে সরাসরি বিতর্কে না গিয়ে বোদ্ধারা বিশ্লেষণ করতে বসলেন, কার আমলে ফরাসি ফুটবল বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে? ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের পরই জ়িদানের পালে হাওয়া লাগার শুরু। পরের দু'বছরে যা আরও গতি পেয়েছিল। প্লাতিনি তিনবার খেলেও কখনও বিশ্বকাপ জেতেননি। তাঁর সেরা সাফল্য ১৯৮৪-র ইউরো কাপে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করা। তা ছাড়া, প্লাতিনির যা সাফল্য সবই ক্লাব স্তরে। আটের দশকে জুভেন্তাসকে ইউরোপের সেরা ক্লাব করেছিলেন, নিজে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার সম্মান পেয়েছিলেন বহুবার। এদিক থেকে 'জ়িজু' অবশ্যই এগিয়ে প্লাতিনির চেয়ে। শুধু বিশ্বকাপ এবং ইউরো কাপ জেতা নয়, তিনবার ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হয়ে সোনার বুটের মালিকানা দখলে আনা, রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়নস লিগ এনে দেওয়া—সব মিলিয়ে ঝাঁ-চকচকে জ়িদানের সি ভি! এখনও জাতীয় দলের প্রথম একাদশে তিনি অপরিহার্য। ফরাসি দলকে চাগিয়ে তুলতে দরকার পড়ছে সেই জ়িদানেরই। গত বছর ইউরো কাপে ব্যর্থ হওয়ার পর জ়িদান নীল জার্সি তুলে রেখেছিলেন। ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, "আর ফিরছি না।" জ়িদান সরে যাওয়ার পর থেকেই প্রাক-বিশ্বকাপ ম্যাচগুলোয় ফ্রান্সের নাজেহাল অবস্থা। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, 'প্রথম বিশ্বকাপ জেতার সাত বছরের মধ্যেই কি আবার দেশের ফুটবল ধসে পড়বে?' তবে আপাতত এই প্রশ্নের দ্য এন্ড। জার্মানি যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে ফ্রান্স। তার পিছনেও সেই 'জ়িদান ফ্যাক্টর'! জ়িদানের হাত ধরে সেপ্টেম্বরে মরণবাঁচন ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে আর অক্টোবরে সঁ দেনিতে সাইপ্রাসকে উড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্স পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের মূলপর্বে।



গোটা দেশ আকুলভাবে চেয়েছিল অবসর ভেঙে ফিরে আসুন তিনি। এসেছেন, গড়পড়তা ফরাসির প্রত্যাশাকে মর্যাদাও দিয়েছেন যথাযথভাবে। সামনে লক্ষ্য, জীবনের শেষ বিশ্বকাপে আরও একবার জ্বলে ওঠা! ২০০৭ সাল পর্যন্ত রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি জ়িদানের। বলেছেন, রিয়ালে থেকেই শেষ করতে চান। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আসলে নতুন করে ফুটবল থেকে আর কিছু পাওয়ার নেই। তবুও এই ৩৩ বছরে পৌঁছেও 'ফোকাস'টা টলেনি। জ়িদানের সঙ্গে অন্যদের তফাতটা যে এখানেই!



# মোটর রেসিংয়ের ‘নতুন রাজা’

**ফরমুলা ওয়ানের কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখারকে হারিয়ে ফার্নান্দো আলোনসো হলেন এ-বছরের দ্রুততম এফ ওয়ান রেসার। লিখেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

সিংহাসনটা দখলে চলে এসেছিল সেপ্টেম্বরের শেষাশেষিই। ব্রাজিলিয়ান গ্রাঁ প্রি-তে ফরমুলা ওয়ানে নতুন ‘সূর্যোদয়’। মাত্র ২৪, অথচ ইতিমধ্যেই ফরমুলা ওয়ানের ‘নতুন রাজা’। রেকর্ড বুক বলছে, ফরমুলা ওয়ানের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন এই স্পেনীয়। যাঁকে হটিয়ে ফার্নান্দো আলোনসো রাজমুকুট দখলে আনলেন, সেই মাইকেল শুমাখার তো বটেই, সার্কিটের অন্যরাও এবার ম্লান হয়ে গিয়েছেন উত্তর স্পেনের এই নতুন ‘আইকন’-এর কাছে। তবুও, একটা আফশোস থেকেই গিয়েছে আলোনসোর। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়তো হলেন, কিন্তু মোট খেতাব জয়ের সংখ্যায় নিকটতম প্রতিপক্ষ কিমি রাইকোনেনকে হারাতে পারলেন না যে! দু'জনেই সাতটা করে রেসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি সাংহাইয়ে বছরের শেষ গ্রাঁ প্রি-তে জেতার পর আলোনসো বলেই ফেলেছেন, “কিমিকে এ যাত্রায় হারানো গেল না, এটাই খানিকটা বেখাপ্পা ঠেকছে।”

ফরমুলা ওয়ানে আলোনসো রেনল্টের হয়ে নামেন, রাইকোনেন নামেন ম্যাকলরেনের হয়ে। এই দু'জনের মধ্যে গোটা মরশুম জুড়েই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়ান গ্রাঁ প্রি থেকে মাঝ অক্টোবরের চিনা গ্রাঁ প্রি, ১৮টা রেসের শেষে সকলের উপরে রইলেন আলোনসো। ১৩৩ পয়েন্ট পেয়ে তিনিই বিশ্বসেরা। রাইকোনেন দু'নম্বরে (১১২ পয়েন্ট)। মাইকেল শুমাখারের এবার করুণ হাল। মান ৬২ পয়েন্ট পেয়ে কোনওরকমে তিন নম্বরে শেষ করেছেন। সার্কিটে অবশ্য আলোনসো ছাড়াও টিম রেনল্টের হয়ে লড়াইয়ে ছিলেন এক ইতালীয়। সেই জিয়ানকার্লো ফিসিকেলার সার্বিকভাবে পঞ্চম হয়েছেন। আর আলোনসো-ফিসিকেলা যুগলবন্দির জন্যই ফরাসি মোটর প্রস্তুতকারক সংস্থাটি এবার তুলে নিয়েছে দলগত খেতাবও। ১৯১ পয়েন্ট অর্জন করে রেনল্ট নতুন চ্যাম্পিয়ন, ম্যাকলরেন মার্সিডিজ (১৮২ পয়েন্ট) আর ফেরারি (১০০ পয়েন্ট)-কে পিছনে ফেলে।



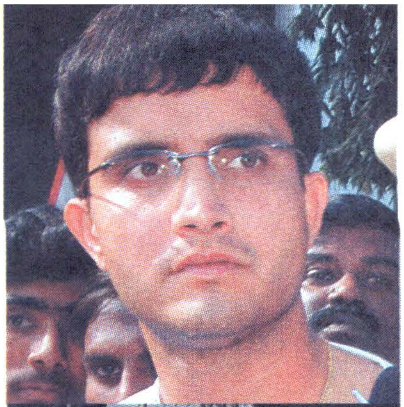
গোটা মরশুম জুড়ে প্রায় প্রতিটি রেসেই আলোনসোর চোখে পড়ার মতো পারফরমেন্স গ্রাফ! সাতটা গ্রাঁ প্রি-তে জিতেছেন, প্রথম চার-এ থেকেছেন আরও অন্তত পাঁচটায়, সে জায়গায় শুমাখার তো চারটি গ্রাঁ প্রি-তে রেসই শেষ করতে পারেননি।

ম্যাকলরেন কোনওদিনই আলোনসোকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। এবার বিশ্বখেতাব জেতার পরও নিজের টিমের কিমি রাইকোনেনকে অনেক এগিয়ে রাখছেন। আর ‘রন’-এর সঙ্গে ‘তাল’ মেলাচ্ছেন সার্কিটের পোড়খাওয়া কিছু বিদগ্ধও। আলোনসোকে এগুলোই তাতাচ্ছে। ওঁর অনুরাগীরা আশ্বস্তই হচ্ছেন একটা ব্যাপারে যে, ২০০৬ মরশুমেও একইরকম ‘ফোকাস্‌ড’, আত্মনিবেদিত থাকবেন ফার্নান্দো আলোনসো। •

ক্রিকেট

**সৌরভকে বাতিলের খাতায় ফেলেছেন অনেকেই। কিন্তু দলীপ ট্রোফিতে সেঞ্চুরি করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখনও তাঁর দিন শেষ হয়ে যায়নি। সৌরভপ্রেমীরাও চান তাঁর ব্যাট আবার ঝলসে উঠুক। জাতীয় দলে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন অনুপম দাশগুপ্ত**

# সৌরভের পরীক্ষা







গুজব রটেছে, অক্সফোর্ড তাদের অভিধানে একটি শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে। শব্দটা নিছক একটা বাঙালি পদবি। কিন্তু তার ভিতর লুকিয়ে থাকা অর্থ জানলে তেলেবেগুনে চটে যাচ্ছে বাঙালি। শব্দটা হল 'গাঙ্গুলি'। যার অর্থ 'ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি অফিসে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যান।' ইঙ্গিতটা না বোঝার কারণ নেই। আমাদের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলা। সম্প্রতি তিনি ব্যাটে রান পাচ্ছিলেন না। উইকেটে যেতে না-যেতেই আউট হয়ে ফিরে আসছিলেন। তা নিয়েই রসিকতা। তাই সিংহভাগ বাঙালি এমন রসিকের মুণ্ডপাত করছেন। সেইসঙ্গে প্রার্থনা করছেন, পুরনো সৌরভ ফিরে আসুন। তাঁর যে ব্যাট একদিনের ক্রিকেটে থেকে দশ হাজার রান তুলেছে, সেটা আবার ঝলসে উঠুক। এই লেখা লেখার সময় আবার এককাট্টা হয়ে আশায় বুক বাঁধছেন, কারণ নেতৃত্ব হারিয়ে এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম দুটি একদিনের ম্যাচ থেকে বাদ পড়ার পর দলীপ ট্রোফির ম্যাচে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন। সৌরভ পারবেন? না, পারবেন না? সৌরভপ্রেমীদের আবেগ বলছে, পারবেন। এই দলে আছেন ওয়াদেকরের মতো মানুষ। আবার রাজ সিংহ দুঙ্গারপুররা সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে প্রথমেই বুঝতে হবে গ্রেগ চ্যাপেলের চিন্তাধারাকে। এই 'হাই প্রোফাইল' কোচের লক্ষ্য, ২০০৭ বিশ্বকাপ। যাঁদের বয়স তিরিশ বা তার এদিক-ওদিক এমন ক্রিকেটারদের তিনি তৈরি রাখতে চান। তারকা অবশ্যই থাকবেন। কিন্তু গ্রেগ চান তাঁরাও তরুণদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো ফিট থাকুন। সৌরভ কী সেটা পারবেন? বিতর্কিত ই-মেলে চ্যাপেল কিন্তু জানিয়ে রেখেছেন, পারবেন না। বাস্তব পরিস্থিতিটা হল, ২০০৭-এর দলে এই বঙ্গসন্তানকে বিদেশি কোচ এই মুহূর্তে কোনও জায়গা দিচ্ছেন না। তাই সৌরভ দারুণ খেলতে না পারলে কোচ যে নির্বাচকমণ্ডলীকে বারবার প্রভাবিত করবেন বলাইবাহুল্য। দলীপে একটা সেঞ্চুরি যথেষ্ট নয়। জাতীয় দলে ফিরতে পারলেও ধারাবাহিকতা চাই। দশ হাজার নয়, নির্বাচকদের ফোকাস এখন 'শেষ ক'টা ম্যাচে সৌরভের গড় ১৬ বা সর্বশেষে ওয়ান ডে সেঞ্চুরি কবে হয়েছে'র মতো পরিসংখ্যানে। এখন যা অবস্থা তাতে সৌরভকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সৌরভের ব্যাটই। আর একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব ফিরে পাওয়া? সেটাও এখন অনেক 'কিন্তু' আর 'যদি'-র উপর ঝুলে। শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড় যদি সফল হন তা হলে সৌরভের আশা নেই। ব্যর্থ হলে অবশ্যই আছে। তবে সেক্ষেত্রেও রানে থাকতে হবে সৌরভকে। না হলে সহবাগ বা সচিনের নাম উঠে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এই হল বাস্তব পরিস্থিতি। যদিও সৌরভের টেস্ট দলে জায়গাটা আপাতত যাচ্ছে না। 'আপাতত' কথাটা বলার কারণ, পূর্বাঞ্চল বাদ দিয়ে অন্য অঞ্চলগুলোর নির্বাচকেরা কিন্তু সুযোগ পেলেই খড়্গহস্ত হবেন। তাই অস্ট্রেলিয়ায় জীবনের প্রথম সিরিজে বাদ পড়ার পর আগামী দু'মাস জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি দিতে যাচ্ছেন সৌরভ।





'চ্যাপেল পরীক্ষায়' কি উত্তীর্ণ হতে পারবেন মহারাজ!



অ্যা থ লে টি ক্স

# অ্যাথলেটিক্সের সেরা বাজি সুস্মিতা

সোমা বিশ্বাসদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন মেদিনীপুরের মেয়ে সুস্মিতা সিংহ রায়। লিখেছেন অভিজিৎ সেনগুপ্ত

বছর কয়েক আগে ত্রিপুরায় একটা মিটে ওর এক রুমমেটের কাছ থেকে সোমা বিশ্বাসকে হজম করতে হয়েছিল একটা প্রশ্ন। "তোমার কথাগুলো এরকম কেন? আমরা তো এভাবে উচ্চারণ করি না! আর তোমার গায়ের রং এত কালো কেন?"

সোমা বলেছিল, "তুই বোধ হয় জানিস না, আমার বাবা আফ্রিকান। মা শ্রীলঙ্কান। তাই উচ্চারণ তো একটু অন্যরকম হবেই। আর আফ্রিকানদের গায়ের রং যেমন হয় আমারও তেমন।"

সেদিন সোমার রসিকতা ওর রুমমেট বেমালুম বিশ্বাস করে যায়।

ক্লাস নাইনে পড়তে-পড়তে মেয়েটা বিধাননগর সাইয়ে ট্রেনিংয়ের সুযোগ পেয়ে যায়। প্রথম দু'দিনই কাকভোরে অনুশীলনে হাজির। তৃতীয় দিন আর পাত্তা নেই। মেদিনীপুর থেকে আসা ওই লম্বা মেয়েটা কোথায়? খোঁজাখুজির পর জানা গেল, মেয়েটা ভূতের ভয়ে পালিয়েছে হুগলিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

তাঁকে যিনি মেদিনীপুর থেকে নিয়ে এসে সাইয়ে জায়গা দিয়েছিলেন, সেই কোচ কুন্তল রায় বলছেন, "অপেক্ষা করুন। অ্যাথলেটিক্স ওকে সব দেবে। হেপ্টাথলনে কিছুই অধরা থাকবে না।"

সুস্মিতা সিংহ রায় চেন্নাইয়ে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ট্রায়ালে প্রথম ঝটকাটা দিয়েছেন ওর বিখ্যাত 'সোমাদি'কে হারিয়ে প্রথম হয়ে। এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের মূল আসরে সোমা সোনা জিতলেও সুস্মিতা ছিলেন ঠিক পরেই। ওর সেরা পয়েন্ট? এখনই পাঁচ হাজার চারশো উনিশ। কুন্তল ওঁর জন্য যে টার্গেট স্কোর খাড়া করেছেন, সেটা সোমারও ছিল না। হ্যাঁ, সাড়ে ছ'হাজারে পৌঁছনোটা নাকি সময়ের অপেক্ষা। কারণ প্রায় সবকিছুই ওর পক্ষে। বয়স, উচ্চতা, অ্যাথলিটদের যেসব জন্মগত গুণ লাগে সেগুলো, ব্যাপক পরিশ্রম করার ক্ষমতা, যখন-তখন চোট পাওয়ার প্রবণতা নেই। সোমা, প্রমীলা, শোভা— দেশের সেরা হাইজাম্পাররা যেখানে বারবার মার খাচ্ছেন, সেখানে সুস্মিতা পরিষ্কার এক নম্বর। অন্যরা যেখানে ১.৬০ মিটার লাফিয়ে হেপ্টাথলনে ইভেন্টগুলোয় পড়ে পড়ে মার খান, সেখানে সুস্মিতার কাছ থেকে অন্তত ১.৮০ মিটার লাফ দেখতে পাওয়াটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

চেন্নাইয়ে সুস্মিতাকে ছেঁকে ধরেছিলেন সাংবাদিকরা। সোমাকে হারিয়ে কেমন লাগছে? জবাব এল, "কোথায় হারালাম? আগে সোমাদির সেরা ৬১৮৬টা মারি, তারপর তো জেতা-হারার প্রশ্ন।"

আর মাত্র কয়েক মাস। তারপরই জার্মানিতে ৩২টি দেশ নামবে ফুটবলের মহাযুদ্ধে। মূলপর্বে পৌঁছে গিয়েছে ২৮টি দেশ। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন চন্দন রুদ্র

# ফুটবল মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি



বার্লিন অলিম্পিক স্টেডিয়াম। এখানেই ২০০৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে

গত বছরই বিশ্বকে চমকে দিয়ে ইউরোপ সেরা হয়েছিল গ্রিস। কিন্তু প্রাক বিশ্বকাপে একেবারেই সেই সুনাম ধরে রাখতে পারেনি। ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট ডেনমার্ক, রোমানিয়া, রাশিয়ার মতো দলগুলোরও জার্মানি যাওয়ার টিকিট মেলেনি। ইতালির ১৯৯০ বিশ্বকাপের 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' রজার মিল্লার ক্যামেরুন, ১৯৯৪ বিশ্বকাপে 'সুপার ঈগল' নাইজিরিয়া কিংবা গত কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপে নজর কেড়ে নেওয়া আফ্রিকার সেনেগালেরও একই দশা। জার্মানি বিশ্বকাপে খেলার জন্য আফ্রিকা থেকে এবার যে পাঁচটি দেশ যোগ্যতা অর্জন করেছে তার মধ্যে তিউনিশিয়া ছাড়া বাকি চারটি দলই বিশ্বকাপে একেবারেই নতুন। টোগো, ঘানা, অ্যাঙ্গোলা ও আইভরি কোস্টের জার্মানি বিশ্বকাপই হবে প্রথম বিশ্বকাপ। এশিয়া থেকে গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সৌদি আরব এবার মূলপর্বে উঠে এলেও প্রাথমিক পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি চিন। তার বদলে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের পর আবার মূলপর্বে উঠে এসেছে ইরান।

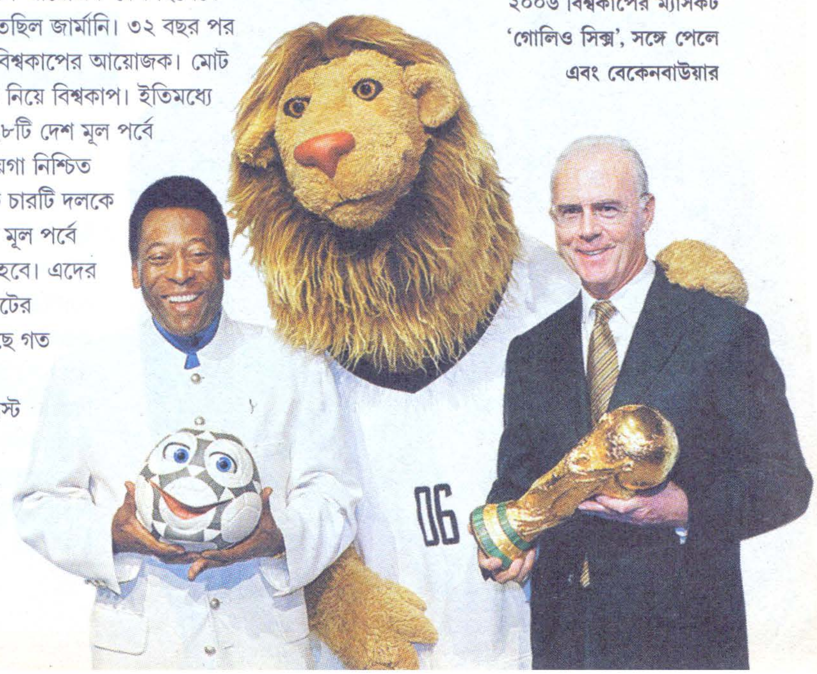
গত বছরই ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন আন্দ্রে শেভচেঙ্কো। এবারই প্রথম ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে শেভচেঙ্কোর দেশ ইউক্রেন। আর-এক নতুন দেশ সার্বিয়া ও মটেনেগ্রোর সঙ্গে জার্মানিতে আবার বিশ্বকাপ খেলবে নেদারল্যান্ড্স। ১৯৯৮ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবার জার্মানি যেতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সংকট মুহূর্তে জিনেদিন জিদান অবসর ভেঙে দলের হাল ধরায় শেষ রক্ষা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে আয়োজক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছিল জার্মানি। ৩২ বছর পর আবার তারা বিশ্বকাপের আয়োজক। মোট ৩২টি দেশকে নিয়ে বিশ্বকাপ। ইতিমধ্যে জার্মানি সহ ২৮টি দেশ মূল পর্বে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। বাকি চারটি দলকে প্লেঅফ খেলে মূল পর্বে উঠে আসতে হবে। এদের মধ্যে ফেভারিটের তালিকায় আছে গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট তুরস্ক, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও উরুগুয়ে। আগামী ৯ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচি ঠিক হবে লিপজিগে।

ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ ডাকটিকিট, লোগো এবং ম্যাসকট। জার্মানির জিম হেনসন কোম্পানির তৈরি গোলিও সিক্স নামের একটি খেলনা সিংহ ২০০৬ বিশ্বকাপের ম্যাসকট নির্বাচিত হয়েছে।

আগামী বছর ৯ জুন থেকে ৯ জুলাই বিশ্বকাপ ঘিরে মেতে উঠবে জার্মানির ১২টি শহর। বিশ্বকাপ উপলক্ষে জার্মানিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ক্রীড়ানুরাগীর আসার কথা। দর্শকদের চাপ সামলাতে হোটেল রেস্তরাঁগুলো তৈরি।

২০০৬ বিশ্বকাপের ম্যাসকট 'গোলিও সিক্স', সঙ্গে পেলে এবং বেকেনবাউয়ার

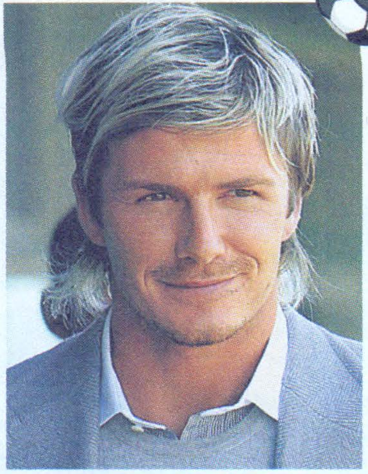


## মহিলা ক্রিকেটারের খোঁজে

মেয়েদের ক্রিকেটে এক সময় বাংলাই ছিল চালকের আসনে। ১৯৭৩ সালে এদেশে মহিলা ক্রিকেট চালু হওয়ার পর প্রথম সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। বাংলার মহিলা ক্রিকেট আজ সেই কৌলিন্য হারিয়েছে। সেটা ফিরিয়ে আনতেই উদ্যোগী হয়েছেন বাংলারই প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটাররা। তাঁরা 'লেডিস ক্রিকেট ফেডারেশন অফ বেঙ্গল' তৈরি করেছেন নতুন প্রতিভা খোঁজার জন্যে। কলকাতা ও জেলায়-জেলায় প্রশিক্ষণ শিবির চালু করছেন তাঁরা।

## বেকহ্যামের ফুটবল আকাদেমি

সব সময়ই খবরের শিরোনামে ডেভিড বেকহ্যাম। কখনও ফুটবল তো কখনও ফ্যাশন শোয়ে দুরন্ত পোশাকে নজর কেড়ে নেন তিনি। তবে অ্যাসেজ জয়ের পর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাগ বসিয়েছেন ফ্লিন্টফ, পিয়েটারসেন, ভনরা। তাই কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বেকহ্যাম? বাজে ফর্মে থাকা সত্ত্বেও ক'দিন আগেই রিয়াল মাদ্রিদের কাছে বছরে চার কোটি পাউন্ড পারিশ্রমিক চেয়ে খবর হয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের এই তারকা ফুটবলার যে 'ডেভিড বেকহ্যাম ফুটবল আকাদেমি' খুলতে চলেছেন, সেটা অনেক পুরনো খবর। নতুন খবর হল, এই অ্যাকাডেমি প্রায় তৈরি। দক্ষিণ লন্ডনের এই আকাদেমিতে ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের জন্য থাকছে দু'টি বিশাল মাঠ এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের সব রকম ব্যবস্থা। এখন শুধু মাঠে বল গড়ানোর অপেক্ষা!



## শিশুদের কল্যাণে স্টেফি

একটা সময় টেনিস কোর্ট দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। সহজেই উড়িয়ে দিতেন সেলেস, সাবাতিনি, স্যাঞ্চেজের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের। একের পর-এক গ্র্যান্ড স্লাম জয় করে হয়ে উঠেছিলেন 'টেনিসের রানি'। ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী জার্মান তারকা অনেকদিন পর ফের কোর্টে নামলেন। তবে কোনও প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে নয়। 'চিলড্রেন ফর টুমরো' নামে একটি সমাজসেবী সংস্থা চালান তিনি। শিশুদের জন্য একটি বিশেষ তহবিল তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন দুই সন্তানের জননী স্টেফি। সেই তহবিলের সাহায্যার্থেই জার্মানিতে এক প্রদর্শনী ম্যাচে গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনির মুখোমুখি হলেন তিনি।



## ক্যারমে ছোট্টুর কীর্তি

টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে থেমে থাকেনি তার ক্যারম খেলা। উত্তরপাড়ার ছোট্টু মণ্ডল তার ক্যারম দক্ষতার মাধ্যমে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে বদ্ধপরিকর। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সে জিতেছে বেঙ্গল ইয়ং স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে বর্ষসেরা ক্যারম খেলোয়াড়ের পুরস্কার এবং ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাবের বিচারে বর্ষসেরা প্রতিশ্রুতিমান ক্রীড়াবিদের খেতাব। জেলাস্তর এবং রাজ্যস্তরে সাফল্য তো রয়েছেই, সম্প্রতি এই ১১ বছরের কিশোর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ক্যারম টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাও আবার অপরাজিতভাবে! আন্তর্জাতিক ক্যারমেও বড় ধরনের সাফল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ছোট্টু।

**উত্তম রায়**

## ওয়েবসাইটে অ্যালভিটো ডি'কুনহা

ভারতের দুই ফুটবল নক্ষত্র, আই এম বিজয়ন এবং ভাইচুং ভুটিয়াকে পিছনে ফেলে দিলেন গোয়া থেকে ইস্টবেঙ্গলে খেলতে অ্যালভিটো ডি'কুনহা। প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে অ্যালভিটো নিজের ওয়েবসাইট লঞ্চ করলেন। 'www.dcunha.com' — ওয়েবসাইটির উদ্বোধন করলেন আই এম বিজয়ন। ওয়েবসাইট খুললেই পাওয়া যাবে অ্যালভিটো সম্পর্কে একরাশ তথ্য। ওয়েবসাইটে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বিদেশে খেলার ইচ্ছের কথাও।



**চন্দন রুদ্র**

# ভাল দই তৈরী করা এখন আর আর্ট নয়।

এখন যে কেউ সেরা দই তৈরী করতে পারে। আপনাকে যেটা করতে হবে, তা হ'লো, সুরক্ষামূলক ছয়-স্তরের প্রলেপযুক্ত কারটন প্যাকের ডবল প্যাসট্যারাইজড্ দুধ ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কারটনের দুধ ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ামুক্ত, তাই আপনি পান এর থেকে তৈরী তাজা, স্মুথ ও গাঢ় দই। আপনার পরিবারের জন্য এটাই সবচাইতে ভাল দুধ। সুগৃহিনী হয়ে, সংসারের হাল ধরতে বেছে নিন কারটনের সেরা দুধ।




Leo Burnett D TPIDPKT 1015 A

ANANDAMELA NOVEMBER 2005 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 INR 10.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06